স্মৃতির রেখা

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা-চাঁদের ওশুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষ রাতের আকাশেরপিছনে, এই ফুল ফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দরশান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছপালার বংশ তৈরি হল, আবারচলে গেল—ওই যে পায়রাদল উড়ছে, ওই যে নারকেলগাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ওই যে বন-মুলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি—দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল ?দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে ?এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-হতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মতো অনন্তগহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তারঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলেআসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্না-রাত্রিরমাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীরকেশধূপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোনোবিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছুকম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতেরঅনাগত গ্রাম্য-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে... আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্তিত, অনাহত তুমি যুগথেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশেজ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোনো দূর অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিতহয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমেছোটাছুটি করবে, তখনো তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনাযায় না। অথচ মনে হয়, এই যেন বুঝলাম, এই যেনচিনলাম !শেষ রাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টিজ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয়সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাতদুটি দিয়ে গলাজড়িয়ে ধরে, যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরায়নযখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূরে পশ্চিমআকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচণ্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখনমনে হয় তাদের সেই সরল প্রাণের প্রাচুর্য—তার মধ্যে তুমিআছ।

তাই বলছিলাম যে, কাল শেষরাত্রে তোমাকে হঠাৎদেখলাম। অন্ধকার প্রহরের শেষ রাত্রের চাঁদ—তার পার্শ্ববর্তীশুকতারার পেছনে। তোমায় প্রণাম করি—

আজ কলেজের কালভার্ট বেয়ে উঠছিলাম। বেলা পাঁচটা, ঠিক সন্ধেটা হয়ে এসেছে, ছোট ছোট সেই অজানারাঙা ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে কেমন হঠাৎ আনন্দ এসেপৌঁছলো—নাথনগরের আমগাছগুলোর ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকের আকাশটা—এইসামান্য জিনিসের আনন্দ, কচিমুখের অকারণ হাসি, রাঙাফুলগাছটা, নীল আকাশের প্রথম তারা, ওই যে পাখিটাবাঁকা ডালে বসে আছে, সবসুদ্ধ মিলে এক এক সময়জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্তে আসে।

মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায়, স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরো অসুখী করে তোলে। আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী পড়ছিলাম, তাতেমনে হল এক এক সময় এক-একজন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলেযায় তা নয়, জড়মনকেও বন্ধন-মুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। যেমন সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার এক মুহূর্তেরএকটা দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেই চলে যায়—তেমনি।

কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ নীচমনা তাদের আমরা যেন ঘৃণা না করি...শুধু উচ্চজীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারাওই রকম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারেরবার্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে ?

॥ ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৪, কলিকাতা॥

হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে এল। মনে এল কতকগুলিছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা, সবগুলিই কেমন গভীর, অনন্ত, রহস্যময়। সময়তাদের দু'পাশ বেয়ে ছুটে চলে তাদের কোন্ দূরে নিয়ে ফেলেছে...যেমন ভবিষ্যৎও মানুষের মনে বড় গভীর ওঅনন্ত বলে মনে হয়, অতীতও অল্পদিনের হলেও তারচেয়েও গভীর বলে মনে হয়, রহস্যময় বলে মনে লাগে, হারিয়ে যাওয়ার গভীরতা মাখানো রহস্য তাদের অঙ্গেঅঙ্গে জড়ানো—অনেকদিন হল প্রাচীন অতীতে মিশেগেলেও তাদের গন্ধ, শব্দ, রূপ এখনো আমার মনেরমধ্যেই আছে। মনের যেখানে তাদের আশ্রয়, একদিন কিসে বলা যায় না হঠাৎ সেই তারে ঘা পড়ে যায়, তখন অতীতমুহূর্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, সুখে দুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গল অমঙ্গলে, সৌন্দর্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্তের জন্য উদয় হয়।কিন্তু মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার চোখের ভ্রমজালেরমতো পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়—

॥ ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

হঠাৎ যেন মনে হল হাজার বছর আগে যে সব পাখিবনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরাসন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যেসব ছেলেমেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলেমিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নেরমতো কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সবঅস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলে-পিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি—নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে—ঝোপে ঝোপে—ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এল। রায়েদের কাঁঠালতলায়, পুকুরধারে, টুনুদের উঠানে, নেড়াদের বাড়ির সামনের বড় গাছটার তলায় অন্ধকার হয়ে এল, খেলাঘরেরক্ষুদ্র জগতের চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে।গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকারনক্ষত্রময়ী উদার শূন্য...এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতেপারে—সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেইকোনো জ্ঞান পৌঁছায় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জনলোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞইথেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না...অন্যরূপ শিক্ষা, সাহচর্য, আদর্শ সেরূপ আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যপ্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তাসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণানিয়ে এই মহতী আনন্দবার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণীশোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতেহবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা...

॥৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর॥

আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। তাদের কচি কচি মুখ, তাদের হাসি, তাদের পাগলামি, তাদের সরল শিশু চোখের দুষ্টুমির চাউনি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মনে পড়ছে—ফুলের মতোমুখে কচি ফুলের মতো হাসি... আমরা সেইসব অনাগতশিশুপ্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের জন্য কি রেখে যাব তাই ভাবছি। আগামী হাজার বছরের মধ্যেলাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে, কত শিশুফুল ফুটে উঠছে নির্মল শুভ্র হাসিভরা সুন্দর সৌম্য মেশামেশি গলাগলি করে—তারা সব একসঙ্গে যেন পরস্পর ঠেলাঠেলি করতেকরতে তাদের শিশুমুখগুলি তুলে, অজস্র খইয়ের মতো ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মতো—নীল আকাশে অনাদি অনন্ত কালের রঙের খেলার নীচে—চিরযুগব্যাপী অপরাহ্ণের শান্ত ছায়াভরা মাঠে বসন্তের হাসি দেখছে...ওদের দেখতে পাচ্ছি বেশ—আসবে, ওরা আসবে।

অনন্ত মেঘভরা আকাশে এখানে দু'একটা তারা দেখাযাচ্ছে। ওই সামান্য দুদিনের অতি একঘেয়ে সংকীর্ণ পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে গেলে মনে হয় ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরদোর হবে। হয়তো ওদের অদৃশ্য সাথী তারাগুলো, বড় বড় বিশ্ব, কত সভ্যতা, কত নূতন প্রাণী, নতুন বিবর্তনওগুলোর মধ্যে। কত স্নেহ ভালোবাসা প্রেম জ্ঞান স্মৃতিপ্রীতি, কত

নতুনতর জীবনযাত্রা, কত অভিজ্ঞতা, কতবিচিত্রতা ওদের জগতে আছে, কে জানে ! এই পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে সেই সব নতুনতর জীবন হয়তো আমাদের জন্যে অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছে—এইপরিদৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের থেকেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দূরতম প্রান্তের মোহনায় হয়তো আরো কত লক্ষ বিশ্ব আছে। তাদের প্রত্যেকটিতেহয়তো কত নতুন সূর্য নতুন গ্রহ নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কত নতুন প্রাণী, কত বিচিত্র জীবনযাত্রার ইতিহাস, কতকল্পনার সম্পূর্ণ অতীত ভাবের লীলা, সে সব দূর বিশ্বেরচিরদিনের সম্পত্তি কে জানে ?

॥২২শে জুন, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

এখন থেকে বিশ কি ত্রিশ হাজার বছর পরের কথা। এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরের ওপরে কয়েক শত ফিট পলি জমেগিয়েছে, মনুমেন্টের চুড়োটারও অনেক উপর পর্যন্ত মাটিজমে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে এক বিশাল মহাসমুদ্রপ্রবাহিত হচ্ছে, কত মাছ কত প্রবাল কত ভীষণদর্শন সবসামুদ্রিক প্রাণী তার কুক্ষির মধ্যে...

অনাগত সেই সুদূর ভবিষ্যতের দুটি মানুষ একটাজাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করছে, একটি বালক, বয়স দশএগার বৎসর। অপরটি তার এক আত্মীয়, প্রৌঢ়। নিজের দেশ ছেড়ে তারা বিদেশে চলেছে জীবিকার্জনের আশায়।প্রৌঢ় তার আবাল্য সহচরদের ছেড়ে চলেছে, মনে কত কষ্টহচ্ছে। বহু পুরাতন পিতৃপিতামহের পুণ্যপাদপূত জন্মভিটাছেড়ে যাচ্ছে। কাজেই চিরপরিচিত স্থান আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব ছেড়ে যাবার দুঃখে সে চুপচাপ উদাসভাবেজাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ক্রমবিলীয়মান শ্যাম তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট ছেলেটিসবে বছর দশেক হল পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে বছর পাঁচেক তো তার জ্ঞানই হয়নি। অতএব সবে বছর পাঁচেক হল তার দেখবার শুনবার চোখ-কান ফুটেছে মাত্র—সেচঞ্চলভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে—আঙুল দিয়ে উৎসাহপূর্ণস্বরে এটা ওটা দেখিয়ে বলছে—"ওই দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন পাহাড়টা—ওই দ্যাখো, ওটা কি ?—পাহাড়ের ওপরবন ?বাঃ বেশ তো ?ওই দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন একটা পাখি"—প্রৌঢ় বসে বসে ভাবছে অমুকের কাছে যে দেনাটাছিল সেটা আদায় করে আসবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বড়ভুল হয়ে গেছে তো। অমুকের জমিটার দর আর একটু বেশিদিলে হয়তো দিয়ে দিত—জমিজমা এই সময় নাকিনলে-কাটলে ভবিষ্যতে কি করে ছেলেপিলেদের চলবে ?তার প্রপিতামহ কোন্ প্রাচীনকালে যে জমিজমা করে রেখেগেছেন তাতেই এখনো চলছে—সে সব কি আজকের কথা!তখন সত্যযুগ ছিল, অমুকের দর শুনেছি অমুক ছিল। আরএখন! বাপরে, আগুন, ছোঁয়াও যায় না (দীর্ঘনিঃশ্বাস)... ছেলেটা এই সময় জিজ্ঞাসা করলে—কাকাবাবু, আমরা যেঅমুক শহরে যাচ্ছি সেটা কি খুব বড় জায়গা ?

—ওঃ, কত বড় জায়গা তা দেখিস—পাড়াগাঁয়ের মধ্যেও-রকম জায়গা কোথায় ?

—কাকাবাবু, শহরটা কি খুব পুরোনো ?

কাকাবাবু (মুরুব্বিয়ানার হাস্যে)—হিঃ হিঃ, বলে কিনাখুব পুরোনো ?ওরে পাগল, আমার প্রপিতামহ অমুক যখনঅমুক জায়গার দেওয়ান ছিলেন, তখনো ওই শহর এতবড়ই ছিল...তবে তার চেয়ে এখন অবিশ্যি আরো ঢের উন্নত হয়েছে। ও-শহর আরোপুরোনো—কত পুরোনো তা বলা যায় না, মোটের ওপর অনেক অনেক কালের প্রাচীনজায়গা...

তাদের সমস্ত কথাবার্তার সময়ে অনাগত ভবিষ্যতেরএই দুটি নতুন মানুষ জানত না তাদের জাহাজ যে সমুদ্রবেয়ে যাচ্ছে তার নীচে, অনেক অনেক নীচে, বালি কাদা খোলা পাথর উদ্ভিজ্জ পচা এঁটেল মাটির স্তরের নীচে, ভিন্নযুগের এক বিশাল নগর, তার মেমোরিয়াল মনুমেন্ট প্রাসাদঅট্টালিকা চত্বর বিদ্যালয় গৃহস্থ-বাটী বাগান আশা ভরসাসুখ দুঃখ নিয়ে সবসুদ্ধ একেবারে পুঁতে গিয়ে চাপা পড়েরয়েছে। হয়তো সেই দশ বছরের ছেলেটি তার কোনো দূরজন্মান্তরে সেই শহরের অধিবাসী ছিল, কোনো বিদ্যালয়েরছাত্র ছিল, কত সাথী, কত বন্ধু, কত তরুণী—কত প্রেম, কতস্নেহ...সে কি জানে সে পৃথিবীতে নতুন আসেনি ?তিনশতফিট নীচে মহাসমুদ্রের তলের কয়েক ফিট নীচে, বালি কাদাউদ্ভিজ্জ পচা মাটি-স্তূপের নীচে সুদূর, বহুপ্রাচীন, বিস্মৃতঅন্ধকার অতীতের এক বিলুপ্ত জগতে তার একবারেরজীবন কেটেছে...এমনি সুখ আশা, সুখ দুঃখেই কেটেছে, তার কাছে আজ নতুন লাগছে। তার সেই প্রাচীন, সুদূরঅস্তিত্বের মধ্যে আর বর্তমান নতুন জীবনকোরকের কচিদলগুলির মধ্যে এক বিরাট মহাসমুদ্র, কয়েক শত ফিট পচাকাদার স্তর, আর সহস্র সহস্র বৎসরের এক বিরাট যবনিকাপড়ে রয়েছে।

সামনের সাদা ওই মেঘ-ভরা আকাশ, প্রভাতেরনবোদিত সোনার সূর্যকিরণ, নীল পাহাড়ের উপরকারেরপ্রভাতকিরণে সমুজ্জ্বল বনশোভা শরতের শান্ত রৌদ্রলীলাযে এক অদ্ভুত আশ্চর্য জগতের আভাস দিচ্ছে, এই সব পরিচিত, প্রাচীন,

সনাতন এবং অতি একঘেয়ে বলে মনেহওয়া জগতের পিছনে যে কি বিরাট পরিবর্তনের গতির উদ্দাম নৃত্যের ভাঙাগড়ার খামখেয়ালী লীলা চলেছে, কিঅবাক মুক্ত লীলা-চঞ্চল দৃঢ় জীবনস্রোত বয়ে চলেছে, দুদিনের জীবনে যাকে একঘেয়ে চিরপুরাতন বলে মনেহচ্ছে, সে যে কি বিরাট চঞ্চল, কি গতিশীল, কি প্রচণ্ড, কিরোমান্স যে তার পিছনে, সে কথা ওই নব-আগন্তুকঅপরিপক্কবুদ্ধি শিশু কি বোঝে ?

সে শুধু চেয়ে আছে। তার মুগ্ধ, আনন্দদীপ্ত শিশুনয়নদুটি তুলে সমুদ্রের মধ্যের ছোট পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে, যার চূড়ায় কোন্ এক ধনীর মস্ত একটা সাদারঙের প্রাসাদ, আর নীচে জেলেরা চড়ায় ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরছে।

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতম্"

প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীনপৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসেথাকত। তাদের মাথার উপরকার নীল আকাশে অহরহপরিবর্তনশীল মেঘস্তূপের মতো চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীনআদিযুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনিকরেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতে সূর্যেরআলো প্রাচীন যুগের সাগরবেলায় পড়ত। আরপ্রভাত-সূর্যের আলো এমনই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনেরঝিনুক শাঁখ কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাত। সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালেরগহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণচিহ্নের মতো।

॥২৯শে জুলাই, ১৯২৫, কলকাতা ॥

অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলারধারে বনে বড় বড় তালগাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়াতুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্তভাদ্র-সন্ধ্যায় মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে—এখানে ওখানেজোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

দেখে বসে বসে মনে হল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের একজলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখনপ্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে—সেপঞ্চাশ ষাট লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীনআদিম পৃথিবীর জলার ধারে চারধারে গাছপালাগুলো, আদিম ধরনের সাদাসিধা গাছপালা...Stigmaria, Sigiloria, Lepidopteron, Longifolium ইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্যসৃষ্টির বহু বহু পূর্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন গভীরঅন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্তSaurian-রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখি নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রুপোলী চাঁদেরআলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে।দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষআসবে, পৃথিবী যেন সেজন্য উন্মুখী হয়ে আছে—সেআসবে তবে তার শিল্পকলায় সঙ্গীতে কবিতায় চিত্তে ধ্যানেউপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্ম সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্যে পৃথিবী-মায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এল, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে ?ওই যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার স্তব্ধআকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদটুকু দেখাযাচ্ছে, কে ওর মর্ম বোঝে ?তাই মনে হয় ভগবান যেনমাঝে মাঝে দুঃখ করেন। তাঁর এই বিপুল রহস্যভরা সৃষ্টির সৌন্দর্য ভালো করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমনলোকখুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে তপস্যার পর শান্তমৃত্যুঞ্জয়, অমৃতরস মন্থন করে তুললেন—এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে...তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালেনা পান করবার। কখন যে তাঁর বরপুত্রেরা মাঝে মাঝেপৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছজিনিসে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখভোগলালসার অনেক উর্ধ্বে, ওই অমৃতলোকে, ওই cosmic সৌন্দর্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা দ্যাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু তাদের কথা শোনেবোঝে খুব কম লোকেই—তার চেয়ে সুদের হিসেব করলে ঢের বেশি আনন্দ এরা পায়।

॥ ২১শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীলঅকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে। মুখেতাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা।কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি...সকলেরই হাতেতাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরি চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে মশলাবাঁধা মশালগুলি, জ্বললে গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায়সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালবে ?

অনেক লোকে জ্বালতে এল, কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরেচেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতেপারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালাবার। কেউ চোখ নীচুকরে চেয়েও দেখল না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির চোখেচেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তাদের মশাল জ্বেলেদেবে ?কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচি ?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদেরহাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়তো যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদেরবলে দেবার, দেখিয়ে দেবার, মশাল তুলে জ্বেলে দেবারতো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে ?তার হাতে মস্ত বড় মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকারআলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে, চিররাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বেরসে এক মশালচি—

আয়রে, আয় আয়, আয়।

হাসি মুখে কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে আলোর জ্যোতিতেআকৃষ্ট হয়ে শিশু-পতঙ্গের সব দল ছুটে এল ওদের ছোট্টছোট্ট চন্দন-মশলায় বাঁধা মশাল হাতে নিয়ে। চারধার ঘিরেকাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্যের সঙ্গে নতুন মশালচি আলো জ্বালাতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে—কত অসীমধৈর্যের সঙ্গে। সকলেরই জ্বলল।

ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকেওদিকেবেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই।অপর কোনো অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরকরতে, অপর কোনো আনাগত বংশধরদের হাতের মশালঅমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হল যেমশালচি।

॥ভাগলপুর, ২৮শে আগস্ট, ১৯২৫ ॥

পনের বৎসর আগের এক সন্ধ্যা হঠাৎ বড় স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো। বাড়ির পিছনের বড় কাঁঠালগাছটায় রাঙা শেষসূর্যাস্তের রোদটুকু লেগে আছে, গাছে পাতায়, বাঁশবনেকাঁঠালগাছের তলায়। পথের ধারে শেওড়াবনে অন্ধকার নেমে আসছে, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, পাঁচিলের পুরোনোকোন্ কোণে, মাটির ঘরের দাওয়ায়, খড়ের চালের নীচে।সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে উঠলো, চারধারে কাক, ছাতারে, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ, শালিখ পাখিরা ছায়াভরা আকাশ বেয়ে বাসায়ফিরছে—তখনকার সেই দিনটির আশা আনন্দ আকাঙ্ক্ষাআকুল আগ্রহ—

আজকের এই সন্ধ্যায় আকাশটির রং মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে, কোথাও ওই তুঁতের রং এখনই কালো হয়েউঠছে, কোথাও রোদের সোনার রং ধূসর হয়ে গেল।মেঘের পাহাড় সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। রক্তের পুকুর চোখের সামনে নীল মাঠহয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটাও ওই রকম মুহূর্তে মুহূর্তেপরিবর্তনশীল-সূর্যাস্তের এই আকাশে যেমন মুহূর্তে মুহূর্তেবহুরূপীর মতো রং বদলাচ্ছে ঠিক ওই রকমই আকাশ যেন একটা মস্ত দর্পণ—পৃথিবীর এই অহরহ পরিবর্তনশীল রূপ ওতে যেন সব সময় ধরা পড়ছে। তাই সেটাও একটা বিরাট ছায়াবাজির মতো দেখা যায়।

তরল আনন্দ অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী। Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ—Sadness ভিন্ন জীবনের Profundity আসে না—যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রেআকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশি হয়,তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশেসত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতির্মান হয়ে প্রকাশপায়—তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়তো তারাচিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।

সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটাখুব বড় সম্পদ।

॥২৮শে আগস্ট, ১৯২৫ ॥

এই প্রশ্ন একদিন নিউটনের, কেপ্লারের, গ্যালিলিওরমনে হয়েছিল। সকলেরই মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত।জগতে দুদিনের জন্য আসা—এই জগতের ফলে, জলে, স্নেহে, দয়ায় মানুষ হয়ে এটা কি উচিত নয় যে জগতেরজন্যে কিছু করে যাব ?আমার ছাত্রটি যেমন কচি, সুন্দর, ওইরকম আবোধ শত শত অনাগত শিশুমনের জন্যে উত্তরকালেআমার কী দেবার থাকবে ?আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শত শত কি সহস্র বৎসর পরেও এমন কেউ কেউ ওদের মধ্যেথাকবে যে হয়তো শান্ত পর্বতের ছায়ায়, নির্জন সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণ কোনো গ্রাম্য নদীতীরে, অথবা অন্ধকারগহন-রাত্রে শিশিরভেজা ঘাসের উপর, তারার আলোয়শুয়ে ওরা এইগুলি পড়বে আর মনে আনন্দ, বল, উৎসাহ, আলো পাবে—এই তো জনসেবা, পৃথিবীতে এসে এই করেই তো সার্থকতা—একশত বৎসর পরে আমার নাম দশবৎসর আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মতো কোথায়কালসাগরে মিলিয়ে যাবে—তবে কী রেখে যাব আমারদুঃখের মতো দুঃখী ওই সব অনাগত কচি কচি শিশুমনগুলির খোরাকের জন্যে ?কী রেখে যাব ?কী সম্পত্তি, কী heritage তাদের জন্যে দেব ?

শান্ত, আঁধার অপরাহ্ণে বাড়ির পিছনের বন যখন সন্ধ্যারঅন্ধকারে ঢেকে আসে, পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালেরকোণে যখন বাদুড়ের দল ছটপট করতে শুরু করে, নদীরওপারে শিমুলগাছের মাথা থেকে শেষ বৈকালের ম্লানরোদের ছায়াও যখন মিলিয়ে যায়, তখন বহু দূর ভবিষ্যতের রাশি রাশি ফুলের মতো মুখ, শিরীষের পাপড়ির মতো নরম এই সব অনাগত বংশধরগণের কথা মনে পড়ে। এই সন্ধ্যারমতো অন্ধকারও ওদের মধ্যে কত ছেলের জীবনে আসবে।সন্ধ্যায় এখন আকাশে যেমন জ্বলজ্বলে শুকতারা সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে আবার সূর্যের প্রথম আলোর আগেইমিলিয়ে যায়, ওদের জীবনেও অমনি দুঃখরাত্রের সত্যেরউজ্জ্বল শুকতারা যদি না ফোটে তো কে তাদের আশাদেবে ?তাই কিছু করে যেতে হবে—জীবনটা ছেলেখেলারজিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলেতুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে ফুর্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না,কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালেরশিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করেযাওয়া।

এতে আপন পর কিছু নেই, কী তুমি দেবে এদের ?এদের জন্যে কী রাখছ তুমি ?জীবনের mission কি তুমি অবহেলা করবে ?উপেক্ষা করে ভগবানের পবিত্র মহৎ দানকে পায়েদলে যাবে ?

কোনো কার্য করো বললেই করা যায় না, এ জিনিস সহজ নয়। অনেকদিন ধরে ভাবতে হয়, বাইরের কোনোজিনিস থেকে বাধা-বিঘ্ন না আসে। চিন্তা; শুধু গভীর চিন্তা; অনবরত বাধাহীন চিন্তাতে শান্তমনে গভীর সত্যের উদয়হতে পারে, interrupted হলে সারাজীবনেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না, যা কিনা হয়তো এক বৎসরের নির্জনবাসেই আসতে পারত...By keeping it constantly before one's mind...by always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions...much might be sacrificed to obtain these conditions.

জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও বিরাট স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত, সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।

॥ ৯ই অক্টোবর, ১৯২৫ ॥

মানুষের সামান্য সুখদুঃখ, আমবন কাঁঠালবাগানেরপাতার আড়াল বেয়ে দিব্যি চলছে। Anuyta-র মতো কত মেয়ে কতদুঃখী...সন্ধ্যার আকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্র—কত জগতের ছড়াছড়ি—বিরাট নাক্ষত্রিক শূন্য—ঠাণ্ডা জনহীন—পৃথিবীরফুলফল লতাপাতা সামান্য সুখদুঃখ—গ্রহ নক্ষত্র লাটিমেরমতো ক্রীড়া-বন্দুকের মতো আকাশে ঘুরছে। এইআনন্দলীলায় সব প্রাণীই যোগ দিচ্ছে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে সব ভেসে যাচ্ছে কে জানে হয়তো দূর কোনো অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে।ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলারসকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ, পাখি, মানুষ সকলেই।

কিন্তু ক'জন জগতের বাইরের এই বিরাট শূন্যের দিকেচেয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখদুঃখের ঊর্ধ্বের কথা ভাবে ? Crowd mind-এর বাইরে সকলেই নয়...সকলেইগড্ডলিকা। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। জগতের বড় বড় মনীষাসম্পদ চিন্তাবীর কয়জন ?উপনিষদের ঋষি পথে-ঘাটে সুলভদর্শন নন। সকলেই শঙ্কর নন, প্লেটো নন, নিউটন ফ্যারাডে গ্যালিলিও কোপারনিকাস গাউস ইনস্টিন নন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলারাশির আবরণ ভেদ করে ক'জনের চোখ বাইরের অনন্ত ঊর্দ্ধ আকাশের ঘূর্ণ্যমান... সদাচঞ্চল বিরাট বিশ্বজগতের দিকে যাবে ?

দুই এক জনের—তারা জনপ্রবাহের কেউ নয়, তারাঅনেক ঊর্ধে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো জড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে Chrysanthemum, কলাফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত...হয়তো একান্ন বৎসর পরে আমার কোনো চিহ্নওপৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা* হয়তোথেকে যাবে। হয়তো কত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে।হয়তো পাঁচশত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষআমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাব। আমারবই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনেরনতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমিআলো জ্বেলে তেল খরচ করে, আমার যথাযোগ্য বুদ্ধিরঅর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুওদেব, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভবকরছি; তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আরদেখতে আসব না। আমার ফুলদানির এই অত্যন্ত বড় বড় ওসুন্দর Chrysanthemum ফুলটা আর বছর এ সময় কোথায়থাকবে ?আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকব?

এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগ-যুগের জনসেবা সে।এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত—শত অনাগত তরুণ মনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কচি প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়েদেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরেরসাময়িক উত্তেজনা নয়, যুগ-যুগের জনসেবা। সে দিক মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়।কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য—চরিতামৃতে কি করেছেন ?বুদ্ধদেব কি করেছেন?স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন ?তাঁদেরএক জন্মের suffering, ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে—কারণ যুগে যুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষলক্ষ কুয়াশাচ্ছন্নমন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। Suffering এদিক থেকে মস্ত জিনিস, কেউ যেন সে কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেয়ো উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, কিন্তু তাচিরদিন লোকের মনে বল দেবে। পূর্ণ-অন্ধকার অমাবস্যারপরই শুক্লপক্ষের চাঁদ ওঠে—দুঃখের রাত্রিতেই তারা খুবউজ্জ্বল হয়।

॥২০শে নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এই মাত্র দ্বিরা থেকে আসছি। আজ ইসমাইলপুর থেকে ভাগলপুর আসবার সময় শূয়রমারীরখেয়া-ঘাটে এপারে যে নৌকা লেগেছিল, যাতে ছেঁড়াখোড়াহলদে রং-এর বই খুলে মাঝিরা পড়ছিল—জনসেবকদেরকথা মনে এলে যেন এর কথা মনে আসে—নৌকাতে যেমেয়েটি ময়লা কাপড় পরে বসেছিল ও নদীতে নেমে কাপড়হাঁটু পর্যন্ত তুলে চলে গেল, ওর কথাও যেন মনে থাকে।মুরাঠা বেঁধে ওরা নাকি কোন্কুটুমবাড়ি নেমন্তন্ন খেতেগেল। আর ওই যে ছেলেটা বললে তার বাড়ি রজীদপুর, ওর কথাও—সাবোর স্টেশনের বাইরে লতাকাটি পাতাকুড়িয়ে আগুন পোয়ানো, গাড়িতে ওই লোকটাকে বিড়িখেতে বারণ করা, এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে বড় বাসারটেবিলটায় এই সব লেখা অনেককাল মনে থাকবে। শূয়রমারীতে আজ ঘি খুঁজলেই পাওয়া যেত—মুকুন্দি বলেছিল—কার্তিক খুঁজলে না ভালো করে। এখানে মোটেইশীত নেই। ইসমাইলপুর কাছারিতে কদিন কি শীতইপেয়েছি। আগুন রোজ সন্ধ্যায় না পোয়ালে রাত কাটত না।রামচরিত রোজ খড়ের বোঝা নিয়ে এসে আগুন করত।সেদিনকার শিকারটা খুব জোর হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে কাদায়কাদায় বেড়ানো—প্রথম কুণ্ডীটাতে এত হাঁস ছিল একটাও মারতে পারা গেল না। শুধু এদিক ওদিক দৌড়ে দৌড়েহয়রান—

॥ ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

---

*'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছিল।

লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে বসে পড়ে তাদের শরীর ঘরটারচারধারের দেওয়ালে বদ্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেকঅনেক দূরে—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞাতনক্ষত্রলোকের দেশে-দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হয়নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণ-দর্শনঅধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণিদের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গাছপালায়ভরা আদিম যুগের জঙ্গলে। এই জগতে সব বড় আনন্দহচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিসে কোনো সুখ নেই।

এই নতুন জিনিসের আনন্দ, অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎভরা। মানুষের সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির চার পাশ ঘিরে, তার চোখের সামনে, তার কানের সামনে তার অনুভব ওস্পর্শশক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। তার দূর দিক্‌চক্রবালেরওপারে ঘন-ঘন আবছায়া কুয়াশার অস্পষ্ট কল্লোলও শোনাযায়—এত দূর সেদিক। এই অসীম অজানা সাগর মানুষকেঅজানার আনন্দ দেবার জন্য যেন তার চারধার ঘিরেআছে। কে আছে যার সাহস, বুদ্ধি, মন এত দৃঢ় যে অজানার দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চলে ?কূল আঁকড়ে তো সকলেইপড়ে রইল। দিক্‌দিশাহারা অকূল-রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে—কোথায় সে বীর ব্রাত্য, মুক্ত আত্মা ?

সংসারের ধূলায় পড়ে সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে—সুদেরহিসাবে দিন যাচ্ছে, গাঁজা খেয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করছে, সংসারের সবাই আনন্দকে খুঁজছে। কিন্তু আনন্দের জলধি যে সামনে অক্ষুণ্ণ রইল তার দিকে তো চাইবে না।

সে উচ্চ আনন্দের ভাণ্ডারকে ব্যবহার করবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা সকলের থাকে না, অধিকার সকলের থাকে না।

এই জন্যই মনে হয় সংসারে কাউকে ঘৃণা করলে হবে না। মানুষ এই উচ্চ ব্রাত্য, আনন্দের খবর না জানতে পেরেই অ-সুখে হিংসায় ধূলায় কাদায় পড়ে লুটোপুটি খায়।স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজের সুখ খুঁজতে নিজেকে আরো হীন, অসুখী করে তোলে। তাদের দোষ নেই। হতভাগ্য তারা—সকলেআনন্দকেই খুঁজছে। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে আনন্দেরপথ না জেনে ভুল পথ ধরেছে। শুধু অবগুণ্ঠনময়বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য-লোকের অজানা জীবনানন্দেরপথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা এমন হয়েছে।নইলে একবার চোখ ফুটলে তারা সকলেই ঠিক পথই ধরত, কারণ নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। কেউ নেই—কেউ নেই—তাদের মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। কোন্মুক্তপুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা নব-আনন্দের তড়িৎলেখায় তাদের উপেক্ষিত অন্ধবুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে ?

॥ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ॥

হঠাৎ জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম—বাইরে শীত কমেগেছে—জ্যোৎস্নাসিক্ত লম্বা ছায়া পড়েছে—আলো-আঁধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া—মনে হল এই যে সুন্দরপৃথিবী, এই জ্যোৎস্না ছায়া, ওই রহস্যময় চিন্তা পাঁচশোবছর ধরে কোথায় থাকবে ?

ওই দূরে যেকুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করছে, এই বাঁশঝাড়েরবাঁশগুলো—আজ যারা সব জীবন্ত স্পষ্ট মূর্তিমান—আজআমার জীবনের যে দুঃখ সুখ আমার কাছে স্পষ্ট জীবন্ত, তারা সব কোথায় থাকবে ?কোথায় মিশে যাবে—কোন্দূরঅতীতে ?আবার তাদের জায়গায় নূতন অনুভূতি—এতদিনের অচঞ্চল, গতিহীন জড় সংসার যেন হঠাৎ তারচোখে সচল গতির বেগে জ্বলন্ত হয়ে উঠল, যা এতদিনছিল বন্ধ, হয়ে উঠলো রহস্যময় জীবন্ত গতিশীল—পথিকবিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে, তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ জীবের ব্যথা, কত অতীতের কত বেদনা-ভরা বুক তার, যুগযুগের বিরহ জন্মমৃত্যুর মধ্যেদিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ, সৃষ্টির কত ফুল কত রহস্য নিয়ে যে চলেআসছে। হয়তো অনেক দিন পরে সৃষ্টি যখন সুন্দর হবে আগের চেয়েও, তখন দূর স্বর্গের কোনেকোণে মস্ত বড় জ্যোতির্বাতায়ন খুলে রেখে অতীতদিনের জীবের কাহিনীতার মনে পড়ে যায়—অনন্তের পাষাণ আনন্দ বেয়ে যারাকত কতদিন মিশিয়ে গেছে—বুক হয়তো তার অনন্তের ব্যথায় ভরে ওঠে।

॥ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

অসীম অনন্ত রহস্যভরা আকাশ—স্তব্ধ রাত্রি। পৃথিবীসুপ্তির অন্ধকারভরা। এখানে ওখানে দুই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে মাত্র; মাঝে-মাঝে বাতাস লেগে নিমগাছের ডালপালার মধ্যে সির্ সির্ শব্দ হচ্ছে। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে একটা নীরবতা। অন্ধকারআকাশে নিমপাতার ফাঁক দিয়ে একটা তারা যেন অসীমরহস্যের বুকের স্পন্দনের মতো ঢিপ ঢিপ করছে। তারাটাক্রমে-ক্রমে নেমে যাচ্ছে—আগে যেখানে ছিল ক্রমে তাথেকে নীচে

নামছে। এই অনন্ত, সনাতন জগৎটা যে কিভয়ানক রুদ্র লীলা প্রচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তা ওইসঞ্চরমাণ তারাটিকে দেখলে বোঝা যায়। অন্ধকারের পিছনেএকটা অসীম অনন্ত সৌন্দর্যলোক যেন আবছায়া আবছায়া চোখে পড়ে। ওই তারার হয়তো একটা স্বাতী নক্ষত্র আছে। তা পার্থিব চোখের বাইরে, হয়তো তাতেও একটা আমাদেরমতো উন্নত ধরনের জীব থাকে। কি হয়তো আমাদেরচেয়েও উন্নততর বিবর্তনের প্রাণীর বাস। কি তাদের সভ্যতা, কি তাদের ইতিহাস, কি তাদের প্রেম স্নেহ, জ্যোৎস্না সৌন্দর্য... জানতে ইচ্ছা যায়। এই রহস্যভরা বিশ্বের বুকের স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয়—আরো কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য, অব্যক্ত, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে ছড়ানো। তালোক-কোলাহলে শোনা যায় না। এই রকম গভীর রাত্রিতে এই রকম নির্জন জানালার ধারে বসে এক মনে আঁধারভরাআকাশের স্পন্দনমান নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে থাকলেগভীর রাতের দক্ষিণ বাতাস যখন কালো গাছপালার মধ্যে সির্-সির্ বয়ে যায় তখন যেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট তারবুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়।

আনন্দের রহস্যের গভীরতায়, বিপুলতায় মন ভরে ওঠে। জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন, অসীম রহস্যময় অনন্তের পথে মহিমময় যাত্রাপথেরপথিক যে জীবন, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিকজীবনের সাংসারিক কর্মকোলাহলে যে মহিমময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাই না, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অনন্ত জীবন সকলেরই জন্যে চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূন্য বেয়ে যার উদ্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা, সে জীবন একটু-একটু চোখে পড়ে।

ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়েব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্যেঅপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোনো শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁশিয়ার জীবন যখনশেষ হয়ে যাবে, সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্যতোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা-আপনিই হবে, কোনো ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্নাভালোবাসো ?ফুল, ফল, পাখি ভালোবাসো?গান ভালোবাসো ?পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনীশুনে চোখে জল আসে ?মন আকুল হয়ে ওঠে ?আর্তেরকান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও ?তবে তুমি অনন্ত জীবনেরউত্তরাধিকারী। তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুশিআনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে-নক্ষত্রে দেখে বেড়িয়ো, কত দীন দরিদ্র, আতুর জীব কঠিনসংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জন নদীর তীরে কেউ হয়তোবসে-বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টাকোরো, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সে-ই তোমার স্বর্গ হবে।চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকত না। সবসুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমনমরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ-খাঁ করত—মাঝে-মাঝেআর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছেবলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেকদিন আগে মরে-যাওয়াছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়েআসছে। পাখির গানে কারণ গৌরীর উদাস মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যেবুড়িটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগেঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদারশোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানেবাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতিদুর্ভাগা। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন একটু থেমেছে। অন্ধকার যেন আরো একটু গভীর হয়েছে। তারাটা আরো নেমে গিয়েগাছের ডালের আড়ালে পড়েছে—কি রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব গতিকি শান্ত নিরীহতার আড়ালেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ঝির-ঝির বাতাসে নিমফুলের গন্ধ আসছে—বাতাবিলেবুফুলের গন্ধ আসছে।

তখনো আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনেঘেঁটু ফুল ফোটে, বৈঁচিগাছের নতুন কচি পাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দোয়েল কোকিল ডাকে। কিন্তু তারা আর নেই, সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে তারাকোথায় কতদূর চলে গিয়ে কোন্দূর অতীতে মিশেগিয়েছে।

॥৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬, ভাগলপুর ॥

ভাবতে-ভাবতে মনে হল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরি নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া—অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম। যদিও আমি ভাগলপুরে আছি, এখনি এত বড়একটা মিটিং করে এলুম, কাল সকালে হেমেন আসছে, ইসলামপুরে নায়েবের চার্জ বুঝে নিতে যাবে, কিন্তু এই সবের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবিগুলো বড় মনে পড়লো, অনেক দূরে এক গ্রাম্য নদীতীরে কেমন নাটাকাঁটার বন, ধলচিতের খাল, নোনা কাদা, গোল

বেগোল, তারপর সেইপুকুরের ধার, সেই জানালা, সেই বর্ষার দিনে দরমাহাটারমোড়ে পাথুরে চুন ফেলা, সেই পানচালায় শোয়া, সেই কালীডাকছে, ওঃ বড্ড কম।

জীবন কি করে অগ্রসর হচ্ছে ?সাত বছরের এইপরিবর্তন, পাঁচ হাজার বছর পরে কি হবে ?এই বিভূতি, এইনায়েব, এই অম্বিকাবাবু, এই হেমেন, এই আমি কোথায় থাকব ?পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ইজিপ্টে থাকত।তারাও হয়তো ঠিক এই রকম ব্যক্তিগত আশা নিয়েযতীনবাবুর মতো অহঙ্কার করত, বিভূতির মতো ফোর্থক্লাসে পড়বার স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু তাদের আশা অহঙ্কারপ্রেম স্নেহ স্বার্থ নিয়ে কোথায় তারা আজ ?দু-একটা ভাঙা ছেঁড়া মমি ছাড়া সেই বিশাল সভ্যতার অতীত জনসঙ্ঘের কি চিহ্ন পাওয়া যায় ?

ওই রকম আমাদেরও হবে। আমরাও আমাদের দ্বন্দ্ব, মারামারি, অহঙ্কার, আশা, দাম্ভিকতা, ভালোবাসা, স্নেহ, দয়া নিয়ে বুদ্বুদের মতো মহাকাল-সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাব। আমাদের জায়গায় আবার নতুন একদল আসবে।তাদের ঠিক এই রকমই সব হবে। তারাও বলবে—আমরাবড় হব, আমরা জমি কিনব, বিষয় কিনব, সুদে টাকা ধারদিয়ে বড় মানুষ হব, বই লিখে নাম করবো—তারা বুঝতেপারছে না, তাদেরই পায়ের মাটির তলায় এক নয়, কতলক্ষ লক্ষ generation তাদেরই মতো ভেবে কেঁদে হেসেআশা করে অহঙ্কার করে, সুখী অসুখী হয়ে বগল বাজিয়ে নেচে কুঁদে হামবড়াই করে বর্তমানে ধুলোমাটি হয়ে পৃথিবীমায়ের বুকেই কেঁচোর মাটির মতো মিলিয়ে রয়েছে।

এখানে ওখানে, অন্ধকার আকাশে, বহির্শূন্যে—বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ, পাথর, ধাতুর পিণ্ডগুলো মাঝে মাঝেপৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসেজ্বলে উঠে রয়েছে—ওই একটা—আবার একটা—আবারওই—শূন্যটা একেবারে ধাতুর পাথরের উপকরণে ভরা—

ওই বিশ্বজগৎ, সংসারের কোলাহল, ঊর্ধ্বের বড় জগৎটা ওই অন্ধকার শূন্যে আত্মপ্রকাশ করছে।

ওই যে গতি, ও বিশ্বের গতির প্রতীক। শুধু প্রতীক নয়, ও তারই গতি। স্বয়ং সঞ্চরমাণ, ভ্রাম্যমাণ, ঘূর্ণ্যমান, বিশ্ববস্তুরঅংশ। আপনা-আপনি নিয়মে চলেছে। ওর দিকে চাইলেনিউটনের, কেপলারের, হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের, শঙ্করের, বরাহমিহিরের জগৎ মনে পড়ে—সে জগৎ ডাক্তার শরৎ সরকারের জগৎ নয়, গবর্নমেন্ট প্লিডার অমুকের জগৎ নয়, অমুক বড় মানুষ পেটো মহাজনের জগৎ নয়, অমুক সেটেরঅমুক ম্যানেজারের জগৎ নয়। কত পৃথিবীর, বিশ্বের ভাঙা টুকরো ও ! কত ইতিহাস ছিল তাতে ! কত জীব কত সভ্যতা কত উত্থান-পতন কি বিরাট রহস্য ওর আড়ালে প্রচ্ছন্নরয়েছে ! কি অনন্ত ধ্যানের চিন্তার সৌন্দর্যস্বপ্নের ধারণারজ্ঞানের বিষয় ওই পাথরের ধাতুর টুকরোগুলো তা কেভেবে দ্যাখে ?

আবার আকাশে চাও, Sirius-এর পাশের, কতগ্রহনক্ষত্রের পাশের অদৃশ্য জগৎগুলোর কথা ভাবো।অন্ধকারে গা লুকিয়ে কোথায় ওরা অনন্ত-পথে ঘুরছে ?কিজীববাস তাতে ?তাতে এরকম কত জীবের উত্থান-পতন ?কত দিনের ইতিহাস ?

তবে এই পরিবর্তনের মধ্যে, এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদদুর্গের মধ্যে আসল জিনিসটা কি ?জনসেবা—এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি করে সত্যকে উপলব্ধি করে শাশ্বত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে, ধ্যানে কল্পনায়, ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া। নয়তো এমন কাঁদিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল কাঁদবে, এমন হাসিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল হাসবে, এমনভাবিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল ভাববে, এমন দেখিয়েযাওয়া যে তারা চিরদিন দেখবে।

শিক্ষকতা নয়, জনসেবা—দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্রহয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।

বৎসরে-বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে—কত নতুনমুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীমনীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে-বৎসরে এরকম কচি পাতা ওঠা গাছপালা, বেলফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি-ষাঁড়া-বাঁশবনের আড়ালেযে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আমবনেরছায়ায়-ছায়ায় বেয়ে চলেছে, তারই কথা লিখতে হবে।ওদের হাসিখুশি ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসার যেকাহিনী ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিকআশাহত ব্যর্থতায় দীনতায় চোখের জলে অপমানেউদাসকরুণ, চাদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্‌চিক্‌করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদেরদীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের মনেরমতো ঝুলিঝুলি অন্ধকার ভরা নির্জন—তাকেই আঁকতে হবে—মানুষের এই suffering এত বড়।

বেড়াতে-বেড়াতে চারধারের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসেআসছে। চড়ুইপাখি কিচ্ কিচ্ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ওঅন্ধকার—অনেক দূরে এই ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়াবইছে। বনে বনে বাতাবি লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখনশান্ত সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাবি লেবুফুলের গন্ধ পুকুরের ঘাটেরপথে বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপরপড়ছে। ভিজে কাপড়ে বধূরা ঘাট থেকে বাড়ি যাচ্ছে। আরএখানে ?এখানে চারিদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষেরধুরুইয়া চিৎকার করছে। হুহু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়েচারধার অন্ধকার করে দিয়েছে। ঝাউয়া খুবড়ি, রামজোত, লোধাই, এই বসন্ত, এই নেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে জীবনের মাদকতাময় আনন্দ—magic of life যুগে-যুগে, বিবর্তনে এরকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব, যুগযুগের মাঝখান দিয়ে অনন্ত কাল ধরে চলেছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি—এরকম কত যাব, কতআসবো—কত চড়কে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াব, কত সরস্বতীপূজায় গান শোনা, "ফাগুন লেগেছে বনে বনে", কত Abyssinian horseman, কত চাপা পুকুর, কত অন্ধকারময়ীরাত্রি, কত বর্ষাসন্ধ্যায় কত অজানা বঁধূর মিলন গল্প, কতজনের সঙ্গে বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত সুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটায় সিঞ্চেতার গন্ধ, কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়াভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়িযাওয়া, কত ফাল্গুন দিনে প্রতিভাসুন্দরী পড়া, কত জানালায়ধূপগন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকেজন্মান্তরে নূতন-নূতন আজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে হয়ে আসা যাওয়া, নব-নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।

হে আনন্দময়, যুগে-যুগে তোমার মহারহস্যময়জীবনধারা বিজয়ীবৎ বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন মহাপথছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্মমৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় সে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল

মহাকালের মহাকলেবরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম-সমুদ্রে এখানে ওখানে পাটকিলে রংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে—

॥৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

Life ! Life !

কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্দামঅনুভব করলাম—ওরকম অনেকদিন হয়নি। শক্তির, উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্যের, মাধুর্যের কি বিরাট প্রাণ মন-মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধাবন্ধনহীন গতি-বেগ ! নদীর কূল ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া, ক্ষেপাজোয়ারের কি দুর্মদ, ফেনিল প্রণয়লীলা। মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গণ্ডি তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছ এরা তোমারই ভৃত্য তোমারই দাস।তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখিরমতো বন্দি হয়ে আছো ?তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়।জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে।জীবনের উৎসে মূল শুকিয়ে দেয় অলস নিষ্কর্মা জীবনযাত্রায়।শত্রুকে তাড়াতে হবে।

কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো। উদ্দাম উন্মত্ত বিজয় বিমৃত্যুগতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কী ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর স্টেটমেন্ট ঘাঁটছো !—তোমারমাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ উদাস রহস্যময় অজ্ঞাত, নব-নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতুনীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটিআলোকবর্ষ পারের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুনঅজানা প্রাণিজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, অ্যালুমিনিয়াম;—প্রচণ্ড জাগতিক তেজ X-ray বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জ্বলন্তপুচ্ছ, জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমানধাতুপিণ্ড, প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত রহস্যভরাইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটি প্রাণিরমরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণিদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, কত ফুল ফলবন নদী পাহাড় ঝরনা কত কূলহীন দিকহীন গর্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয়জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। চুপ করে চোখ বুজে বসেএই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রারউৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার দুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ অনির্মল দুষ্টহওয়ার ভাণ্ডার—প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়েপড়ে দ্যাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, ঋদ্ধিশীল ! কিঅক্ষয় অনাদি অনির্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুরলয়-সঙ্গতি।

ঘুঙুর বাঁধা পায়রা হয়ে ছাদের আলসে আঁকড়ে পড়ে থেকো না, বাজপাখির মতো ওড়ো, মাথার ওপরে যে অনন্তঅকুল শাশ্বত নীলাকাশ তার ঘননীলের মধ্যে পাখা ছেড়েদাও, উড়ে যাও—উড়ে যাও—সুন্দর বৈকাল, আমেরবউলের গন্ধ ভেসে আসছে, পাখি ডাকছে, বনঝোপের পাতাসর্-সর্ করছে—জীবনে এ বৈকাল কতবার আসে কতবারযায়, কিন্তু প্রত্যেক অপরাহ্ণই যেন নিত্য-নূতন মনে হয়, কারণ সামনে যে অজানা রাত্রি আসছে। অজানার আনন্দইমানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ। অন্ধকারে সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু আবার সকালে উঠবে। আবার নতুন জীবননতুন ফুল ফল দুর্বা শিশির পাখির গানে আবার সঞ্জীবিতহয়ে উঠবে। আবার কত হাসি কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, কত জানলায় ধূপগন্ধ—

অশান্ত প্রাণপাখি আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বারলোভে ছটফট করছে—জীর্ণ পিঞ্জরদলে শুধু অধীর অকূল পক্ষবিধূনন ! উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত, বহুবারদৃষ্ট, একঘেয়ে, গতানুগতিক গণ্ডির মধ্যে আর নয়, একেবারে অপরিচয়ের অকূল জলধিতে পাড়ি দিতে চায়, হয়তোদূরে-দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশসীমা তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরুপর্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু সেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবেনয়—সেখানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদী বয়ে যায়—দেববধূগণ পীতহরিৎ তারকার আলোকে মৃদুপদবিক্ষেপে জলখেলা করতেনামে।

জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, খাঁচার পাখিরমতো থেকো না। জগতের চলচঞ্চল গতি দেখে বেড়াওদেশে দেশে। দিল্লি আগ্রা গিয়ে দ্যাখো মোগল বাদশাহেরসিংহাসন। ঐশ্বর্য ছায়াবাজির মতো কোথায় মিলিয়েগিয়েছে। পাহাড়ে ওঠো, কেদারবদরীর পথে বেড়াও, আবসাদ দূর হবে, মন দৃঢ় হবে।

॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিশ্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম। নিউ কর্ডলাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষাসতেজ গাছপালা, ঝোপ-ঝাপ, ধানের মাঠ। বাড়িতে-বাড়িতে রান্না চাপিয়েছে—ঘরে-ঘরে যে সুখ-দুঃখের লীলাদ্বন্দ্ব চলছে, কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোটো ডোবারপদ্মবনগুলি !বড়-বড় পদ্মপাতাগুলো উল্টে রয়েছে, সাদাসাদা পদ্ম ফুটে—কেমন যেন সব ভাই-বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়—এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বনজঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠেছোটো ছোটোচাষার চালাঘর, লাউ কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটিরদেওয়াল বেয়ে, মেয়েছেলেরা গাড়ি দেখছে—সেই যে ছোটো ঘরখানা থেকে গাড়ির শব্দ শুনে মা ও মেয়ে ছুটে (বয়স দেখে মনে হল) বার হয়ে এল, আমার এসব কথা আজীবনমনে থাকবে।

॥ ২রা আগস্ট, ১৯২৭ সাল ।।

বড় বাসার ছাদ ভাসিয়ে কি চমৎকার—যেন ঠিক শরতেররৌদ্র উঠেছে আজ। নীল আকাশের এমন চমৎকার স্বচ্ছনীল রঙ অনেকদিন দেখিনি। কি সুন্দর সাদা সাদা পেঁজাতুলোর মতো মেঘের রাশি হালকা গাড়িতে উড়ে চলেছে।চেয়ে-চেয়ে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই পুরোনো দিনের কথামনে আসে—সেই আমাদের খড়ের ঘরখানা, অতীতের কতমধুমাখা দিনগুলোর কথা, সকালে বিলবিলের ধারে সেই বর্ষার মনসা ভাসান শুনতে যাওয়ার উৎসাহ, সেই পেয়ারা খেতে খেতে পুব-মুখো যাওয়া। মা বসে-বসে সেলাই করতেন। নীরব দুপুরে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তাম—সেই সব দিনগুলো। সেই বন্ধুদের বাড়ি বিলাতি কার্ডের ছবি দেখে দেশকে প্রথম চিনেছিলাম, কিন্তু কি চমৎকারলাগে। (আবার চব্বিশ বৎসর আগের একটা এমনি দিনথেকে জীবন আরম্ভ হয় না ?আমি অমনি লুফে নেবো)।

বহুদূরের নক্ষত্রে, গ্রহে কেমন সব জীবনধারা ?সময়েরমাপকাঠিটা তাদেরও কি আমাদের মতো ওই রকম ছোটো, নাবড় ?সেখান থেকে এসে আবার পাকড়াটোলার পথটায় আসন্ন সন্ধ্যায় আবার ঘোড়া ছুটালাম। কখনো মাঠ, কখনোঝোপ-ঝাপ, কখনো উলুবন, কখনো শুধু আকাশ, কখনো ভুট্টাক্ষেত—এই রকম থরে-থরে নূতন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই উন্মুক্ত গতি বড় ভালো। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলে অন্ধকারে ধূসর পাহাড়টাও যেন সঙ্গেসঙ্গে নাচতে থাকে—দূর আকাশে শুকতারা উঠেছে, কি জানি কোন্দূরেরজগৎ, সেখানে কি ধরনের জীবনযাত্রা।

॥ ৬ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল॥

দূরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের শ্যামলতা, চারিধারের স্নিগ্ধ শান্তি, পাখির ডাক, প্রথম শরতের নীল আকাশ এ সবেরদিকে চেয়ে মনে হল কত যুগ-যুগের এমনধারা স্পন্দন এসে মনে পৌঁছবে—একটা কথা মনে ওঠে—মানুষের অমরত্ব ব্যষ্টি

হিসাবে সত্য না সমষ্টি হিসাবে সত্য ?হাজার বছরপরে মনুষ্যজাতি কিরকম উন্নততর ধরনের সভ্য হবে, সেপ্রশ্ন আমার কাছে যতই কৌতূহলজনক হোক, আমি—এইআমার অত্যন্ত পরিচিত আমিত্বটুকু নিয়ে হাজার বছর পরেকি রকম দাঁড়াবো—এই প্রশ্নটা আরো বেশি কৌতূহলপ্রদ।কে এর উত্তর দেবে ?

আজকার এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ মনে যেন ভাসা ভাসা রকমের এই কথা এল যে, মানুষের এই যে সৌন্দর্যানুভূতি, এই গভীর ভাবজীবন—ভগবান কি জানেন না এসব পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে কত সময় নেয় ?যিনি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই পৃথিবী করেছেন তিনি সময়ের এ উপযোগিতাটুকুনিশ্চয়ই জানেন। তা হলেই কি এই দাঁড়ায় না যে মৃত্যুরপরেও ব্যষ্টিজীবন চলতে থাকবে—থেমে যাবে না।

তাই তো মনে হয়, সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে এই আলো পাখি ফুল আকাশ-বাতাসের মধ্যে দিয়ে কত শত শৈশবেরহাসি খেলার মধ্যে দিয়ে কতবার কত আসা যাওয়া।

আজদুপুরের নরম রোদে বড় বাসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছেলেবেলাকার মতো এরকম দুপুরের কথা মনে হল—সেই সইমা, দিদিদের কুলতলা, সইমার বাড়ি রামায়ণ পড়া, সেইহাটবার—সব দিনগুলো একেবারে সেদিনের লুপ্ত স্মৃতিনিয়েই যেন আবার এল—

গভীর রাত্রি পর্যন্ত বড়বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতেকত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেনওইরকম দীনহীনের পর্ণকুটিরে অভাব-অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায়, গ্রাম্যনদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ অপূর্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—

যে জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, উত্থান-পতন নেই—সে কিআবার জীবন ?সেই পুতু পুতুধরনের মেয়েলি একঘেয়েজীবন থেকে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো।

॥৯ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল॥

পূর্বদিকের জানালাটা দিয়ে আজ বেশ ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছে—একটু মুখ তুলে জানালার ওপর গরাদেরফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেই বটেশ্বর নাথ পাহাড়টা দেখা যায়।খাটের পাশে টাটকা তাজা বেলফুলের ঝাড়টা টবে বসানো, একরাশ ফোটা-ফুল বিছানায় শুয়ে এমার্সন পড়তে পড়তে মনে হল ১৯১৮ সালের এমনি রাত—সে-ও ১৪ই ভাদ্র।অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর একটা এঁদোঘরের গুমোট গরমে প্রথম সিট নিয়ে সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম। কত আনন্দে, কত উৎসাহে কী—অপূর্ব মোহ সেদিনের রাত্রির ঘুমঘোরেআমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার পরদিন সকালটিতে আমারসেই নতুন জামাটি গায়ে দিয়ে কত যত্নে কামিয়ে গাড়িধরতে ছুটেছিলাম। সে সব দিনের ইতিহাস আর কোথাওলেখা থাকবে না—নেইও। শুধু এক তরুণ মনে তা আঁকাআছে—আর পঞ্চাশ বছর পরে, কি আর পাঁচশো বছরপরে—সেসব দিনের অপূর্ব পুলকের কাহিনী শতাব্দীর পূর্বেরপ্রথম বসন্তের পুষ্পস্তবকের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তবুযেনমনে থাকে একদিন সে অমৃতধারা বাস্তব জগতের ছিল।

তাই যখন মিউজিয়ামে মমি দেখি তখন সেসব চুর্ণায়মান সাদা হাড়টির বুকে, এই পৃথিবীর নীল আকাশ, রাগরক্ত সন্ধ্যা, বাতাস, আলো, কোনো সুশ্রী শিশুর মুখটি, তরুণীরচোখের দীপ্তি, কোন্নিভৃত অপরাজেয় অজানা ফুলেরসুবাস—এই সব একদিন যে আনন্দের বাণ ছুটিয়েছিল—তিন হাজার অতীতের যে লুপ্ত হাসিগান, মনের শান্তি,—বহুদিন লুপ্ত যেসব জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রাসাদশিখরে পদচারণশীল সম্রাট থট মোমিনের চক্ষুকে মুগ্ধ করেছিল—মরুভূমির দূরপ্রান্তনীল সে সব সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, সে ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণী, খর্জুর কুঞ্জের শ্যামলতা আবার জীবন্তহয়ে ওঠে। তখনো পৃথিবী এমন সুন্দর ছিল, ওই জানালার ছোট্ট ছায়াভরা ঝোপে খঞ্জন পাখি এমনি নাচত—সে মাধবীরাত্রি, সে নাচ আজকালকার কালে কারুর জানা না থাকলেওএকদিন তারা সত্য সত্যই বজায় ছিল।

এমনি আমরাও চলে যাব। কত হাজার বছর পরে আমাদের হাড় মাটির থেকে হয়তো প্রস্তরীভূত অবস্থায়বেরুবে। তখনকার সে হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ যেন না ভাবে এগুলো বুঝি চিরকাল এইরকমদাঁত বারকরা সাদা হাড়ই ছিল—তারা যেন ভুলে না যায়, এককালে সেগুলোও তাদের মতোই এই বিশ্বের আলোজ্যোৎস্নার সকাল সন্ধ্যার অংশীদার ছিল। তাদের বীণায় যে সুরপুঞ্জ বেজে-বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের বুকে অদৃশ্যকালমুহূর্তগুলিতে তাদের লিখন আছে। হে আমাদের স্নেহ-ভাজন উত্তর-পুরুষগণ, সে কথা মনে রেখো।

কাল এমনি কেটে যায়, বৎসরে বৎসরে-ঝোপেঝাপেফুলদল এমনি ফোটে আবার ঝরে পড়ে, একদল পাখি গান শেষ করে মরে হেজে যায়। তাদের ছানারা মানুষ হয়েআবার গান ধরে—গান বন্ধ হয় না তা বলে, ফুলফোটা বন্ধথাকে না তা বলে।

শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, অনন্ত আকাশের অসীমগ্রহতারার মধ্যে হয়তো কত লুকানো অদৃশ্য জগৎ আছে।তাদের মধ্যের জীবদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। উচ্চস্তরবিবর্তনের প্রাণী হলেও জন্মমৃত্যু আছেই আছে। এতবড়নাক্ষত্রিক বিশ্বের যখন আরম্ভ ও শেষ আছে তখন প্রাণীরকথা তুচ্ছ।

অনন্তকালেরমুহূর্তগুলি এই রকম শত শত দৃশ্য অদৃশ্যবিশ্বের কত শত প্রাণীর বুকের কথায় ভরা, কত হাসি ব্যথারগানে সুরময়।

অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগমুহূর্ত ছেয়ে ভেসেআসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দদেওয়াই তার লক্ষ্য। এক পলকে জীবনকে চিনে নাও—দুঃখের পথ বেয়ে যেতে হবে বটে কিন্তু সামনে আনন্দধাম—দুঃখনদীর ওপারে।

উঃ ! কি সত্যি কথাই বেরিয়েছে উপনিষদের ঋষির মুখদিয়ে—

আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে...

কিন্তু এই সকল আবোল-তাবোল ভাবনার মধ্যে এটুকুভুলে গেলে চলবে না যে ১৯১৮ সালে এতক্ষণঅশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এ আলুভাতে ভাত খেয়ে মির্জাপুরেরবেনের দোকানটা থেকে একপয়সায় চক-খড়ি কিনে কাগজেমুড়ে পকেটে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শেয়ালদায় গাড়ি চেপেছি—হয়তো গাড়ি ছেড়েছেও।

তারপর সারাদিন আর একথা মনে ছিল না—বিকেলেরদিকে খুব ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ষাস্নাত আকাশের তলে মাঠেমাঠেবেড়ালাম তখনো মনে হয়নি। এই এখন আবার রাতআটটার পর জানালার ধারে বসে লিখতে লিখতে টবেরগাছটার ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধে সে কথা মনে পড়ল।

এখন সেই বাঁশবনে ঘেরা বাড়িতে অন্ধকার রাত্রি, হয়তো টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কাহিনী দেখব। কতকাল হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়েভাবলাম আজ যদি যাই ?সেই জামাটা পরে ?অন্ধকার রাত্রেভাঙা দরজার ইটগুলো পেরিয়ে পোড়ো ভিটাতে বর্ষাসতেজশেওড়া ভাঁটবন। বনচালতা গাছ—বড় চারাটা। বাঁশঝাড় নুয়ে পড়েছে—ঘনবনে ঝিঁঝি ডাকছে, পিছনের গভীর বাঁশবনে শিয়াল ডাকছে। নয় বছর আগেকার সে রাতটারআনন্দের ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে ?ওই পোড়োভিটার অন্ধকারে, ঘুপসি বাঁশবনের শন্‌শন্ শব্দে, গভীররাত্রিতে বনের দিকে হুতুমপেঁচার ডাকে।

এ সব রাতে একমনে ভাবতে-ভাবতে শুধু এর অসীমরহস্যভরা জীবন বড় চোখে পড়ে—এ কোথায় এসেছি ?কোথায় চলেছি ?সংসারের কলকোলাহলে যা কখনোমনেও ওঠে না, এ সব নীরব অন্ধকার রাত্রিতে জানালারধারে বসে গুনগুন করে কোনো গানের একটা লাইন গাইতে-গাইতে একদণ্ডে সেটা বড় ধরা দেয়। তাই সকল জ্ঞানের পুঁথিতেই নির্জনতার পরিপূর্ণ অবসর ভরা নির্জনতার বড়প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দূরের ওই তারাটার দিকেচেয়েচেয়ে মনে হয় এ রকম হাসিআশাভরা জীবনস্রোতহয়তো ওখানেও চলেছে—কে জানে ?বিশাল Globular Cluster-এর দেশ, বড়-বড় Star Clouds, ছায়াপথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। Sagittarius অঞ্চলের নক্ষত্রঠাসা আকাশটার কথা মনেহলেই মন শিউরে ওঠে—পুলকে অনির্বচনীয় বিস্ময়েআত্মহারা হয়ে ওঠে।

তাই এই নির্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে একজিনিসে। কি সে ?মনকে প্রসারিত করে এই অনন্তেরঅসীমতার সঙ্গে এক করে দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মতো শতশত লক্ষ-লক্ষ আজানা জগৎ—তার মধ্যের অজানাপ্রাণীদের সে সব কত অজানা অদৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত আনন্দ। সে সব কি অজানাউচ্ছ্বাস—তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্বভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।

মনকে সেভাবে যে তৈরি করেছে, জগৎ তার প্রিয়সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

চিত্ত ভাবনাহীন”

কিন্তু ক’জনে চিনতে চায় জীবনকে এ ভাবে ?সকলেই যে চোখ বুজেই থাকে—খোলে না।

অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়েরতলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখেরহাসিতে, তোমার আঙ্গিনায় পাখির ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝির সুরে, নৈশপাখির পাখার আওয়াজে কিন্তু আমি শুনব না, আমি দেখব না, আমি চোখ বুজে আছি—কার এত স্পর্ধাআমার চোখ খোলে ?

॥২৮শে আগস্ট, ১৯২৭, আজমাবাদ কাছারি ॥

আজ আমি ও রাসবিহারী ঘোড়া করে একটুখানি যেতেইভারী বৃষ্টি এল। রাসবিহারী সিং বললে, নিকটে একরাজপুতের বাংলো আছে চলুন।—ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে সেইবাড়ি গিয়ে উঠলাম। তার নাম সহদেব সিং। বাড়ি মজঃফরপুর জেলা। রাশিরাশি ফসল ঘরটার মধ্যে গাদা করা, অড়র ভুট্টা ঝুলছে। বললে, বীজ রেখে দিয়েছে। বৃষ্টি থামলে দুজনে ফিরে চলে এলাম।

॥২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ॥

আজ সকালে মধু মণ্ডলের ডিহির প্রাচীন বকাইনগাছটার ছায়ায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জমি মাপালাম। বৈকালেঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাসটোলারনীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে—ঘোড়ার এক বুক জল হল পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কিঅপূর্ব নীল রং দেখাচ্ছে ! ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীলপাহাড়, ঢালু দূর্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের ঝোপ, উলুখড়ের ঝোপ, বড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখিডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারেবকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্যবায়ু—মনটাযেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামলপ্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

দূরপ্রান্তে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম বহুদূরের আমাদেরবনজঙ্গলে ভরা অন্ধকার ভিটা বাঁশবনের কথা। এই সুন্দর অপরূপ শরৎসন্ধ্যায় গ্রামের লতাপাতা থেকে ওঠা ভরপুরকটুতিক্ত গন্ধটার কথা, সেই বাঁশঝাড়ে শালিখ-ডাকাবাংলাদেশের মায়াসন্ধ্যার কথা, তরুণীরা মাটির প্রদীপ হাতেগৃহ-আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেখাচ্ছে, ঘরে-ঘরে রাত্রিরআবাহন—মঙ্গলশঙ্খের রব।

এসময়ে চাঁপাপুকুরের পুকুরঘাটে, তাদের তেতলার ঘরটায় চট্টগ্রামের দূর প্রান্তের সেই ঘরটাতে, বারিদপুরেরবাড়িটায় ঝালকাটির মণির বাড়িতে না জানি কি হচ্ছে !

মণি বড় হয়েছে—বোধহয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্বতশিখরে নীরব চিন্তামগন। কত শত জন্মেরস্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জন গ্রহেরনির্জন পর্বতে, যুগযুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনেপড়ে—ধীর, নির্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সন্মুখে তারবিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেমকাহিনীরজালেজালে জড়ানোতরুণ সুন্দর মূর্তি তার। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসেবসে শুধু সেএকমন অপরূপ জীবনরহস্য ভাবে—ভাবে—

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে, মাথার ওপরে তারা ওঠে, কোন্সুদূর লোকের পার থেকে অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে—একটা ছবি মনে আসে সেটা নীচেআঁকলাম, ছবিটা আমার মনে আছে, কিন্তু আঁকাটা এখানেহবে না, কারণ আঁকতে আমি জানিনে, তবুও এইটা দেখেমনের ছবিটা মনে ফিরে আসবে।

॥ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

সকালে আজ কি রকম করে বৃষ্টিটা এল ! কাটারিয়ারদিক থেকে ভয়ানক মেঘ করে এল। ঘন কালো মেঘের রাশঘুরতে-ঘুরতে ঝড়ের মুখে হু-হু উড়ে আসতে লাগলো।মাটিতে জল কি মিশকালো ছায়াটা ফেললে ! বড় অশ্বত্থ গাছের ধারের বন্যার জলটা যেন কালো সোনার রং হয়েউঠল। বকের দল ভয়েভয়ে ওপর থেকে মেঘের সঙ্গেসঙ্গেঝড়ের মুখে উড়েউড়ে এপারে আসতে লাগল। কাকের দলকাকা করে ডাকতে-ডাকতে দিশাহারা ভাবে উড়ে আসতেলাগল। তারপর এল ভীষণ ঝড়। শোঁ-শোঁ শব্দে ভীষণ বেগে গাছপালা লুটিয়ে নুইয়ে ফেলে মেঘলোকে ঘুরতে-ঘুরতে বটেশ্বরের পাহাড়ের

দিকে নিয়ে চলল ! কোথায়কোনো সমুদ্রের জলের রাশি কি কৌশলে মাথার উপর দিয়েউড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন ! তারপর এল বৃষ্টি।

বৈকালে ঘোড়া করে বার হয়ে সহদেবটোলার পথটা ধরলাম। দুধারে কেমন বাংলাদেশের মতো কাঁটার ঝোপ, তেলাকুচো লতার গায়ে পাকা তুলতুলে সিঁদুরের মতো রংতেলাকুচা ফল ঝুলছে। ওড়কলমীর নোলক ফুটে আছে, বনসিদ্ধির জঙ্গল, আলোকলতার জঙ্গল, মটরলতা, স্নিগ্ধ বনদৃশ্যকে ভালো করে উপভোগ করবার জন্য আস্তে আস্তে ঘোড়া চলতে লাগল। তারপরে সুখটিয়ার বন্য কুলের জঙ্গলদিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দেখি সামনে কালোয়ারচকহাট। সেখান থেকে জঙ্গল বেয়ে একহাঁটু জলকাদা দিয়েঘোড়া চালিয়ে একেবারে গেলাম কলবলিয়ার ধারে। কাশবনটার কাছে থেকেই দেখলাম ফিকে হলুদ রংয়ের গোল সূর্যটা মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কলবলিয়ার ওপরে তিরাশি সেকেন্ড যেন অপেক্ষা করলো, তার পরেই সে তারতপ্ত মুখখানা লুকিয়ে ফেলতে আর দেরি করলো না।

আবার অন্ধকারে ঘোড়া ছাড়লাম। কুলের জঙ্গল দিয়েকাশবনের ভেতর দিয়ে, জলকাদা ভেঙে ঘোড়া এসে উঠলগ্র্যান্ট সাহেবের জমির অশ্বত্থ গাছটার কাছে। সেখানে পুরোঅন্ধকার হয়ে গেল। একে মেঘান্ধকার, তাতে কৃষ্ণাপঞ্চমী—ঘোড়াও পথ দেখে না, আমিও না। পথে এক জায়গায়অনেকটা জল পার হতে হল ঘোড়াটাকে। অন্ধকারেঅন্ধকারে গোমলা ঘাসের ক্ষেতের মধ্যেকার সুঁড়ি পথ দিয়েচলে আসতে লাগল। চারধারে লোক নেই, জন নেই, আকাশে একটা তারা নেই। সামনে পড়লো আবার সেইজল, সেই জলটায় আবার কুমিরের উপদ্রব আছে। যাইহোক, ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে জল পার করিয়ে মকাইক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এক প্রহর রাত্রে কাছারিতে পৌঁছলাম।

॥ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ॥

বিকালের দিকে অনেক দিন পরে বেড়াতে গিয়েযতীনবাবুর দোকানে কথা বলছি—হেমন্তবাবু টেনে নিয়ে গেলো ম্যাচ্ দেখতে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হল।হেমন্তবাবু, উকিল যতীশবাবু ইত্যাদি। ওখান থেকে ফিরেদুজনে গেলাম হেমেনের কাছে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর ক্লাবে গেলাম। বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্যন্তজ্যোৎস্নাভরা ছাদে বসে রইলাম একা। শুতে যেতে আরইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে শুধুই বসে বসে এই দীর্ঘ নির্জনরাত্রি ভাবতে আর নানা রকম কল্পনা করে কাটাতে।

আনমনে রচি বসি তন্দ্রাদীর্ঘ দিবসের অলসস্বপন—ভাট্পাড়ার সেই বধূ দুটি, যাঁরা বিজয়ার দিনেআমাকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহ করেডেকে জলখাবার খাইয়েছিলেন—আজ হঠাৎ তাঁদের কথামনে পড়ল। সত্যকারের স্নেহ কি ভালোবাসার ঘটনা বিফলেযায় না—তাঁদের সেঅনাবিল স্নেহের ফল এই হয়েছে যে তাঁরা আমার মনে একদিনের জীবনপুলকের সঙ্গিনীরূপেস্থায়ী আসন পেয়েছেন। আজ এই প্রায় তিন বৎসর পরেএই দূর দেশে যখনই ভাবলাম তাঁদের কথা, তখনই আনন্দপেলাম।

মোঁপাসার সেই পলাতক লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল—সেই জাহাজের ডেকে সেই ছোটো ছেলেটি যখন তার হতভাগ্য নির্বাসিত খুড়োকে দেখলে তখন তার বালকহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু !

তাই মনে হল সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফুটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়—অনেকের মন এমনভাবে তৈরি যা কিনা কোনো বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এইগভীরত্বের অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনেরএই দৈন্য অর্থে পূরণ হয় না, ঐশ্বর্যে নয়, সাংসারিক বাবৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সব অপূর্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে-ওঠা মনের সঙ্গে।

এই মোঁপাসার মতো লোকেরা আসেন আমাদের এইবড় অভাবটা পূর্ণ করতে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাবজীবনের গোপনঅনুভূতির কাহিনী তাঁরা লিখে রেখে যান উত্তরকালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীনহীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোনো বিস্তৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনেরকুণ্ডের আরামকেদারায় বসে মোঁপাসার মনে হয় তাঁর চোখেজল এনেছিল, আজ সর্বদেশের নরনারীর চোখে জলআনছে—আজ কতকাল পরে সেই কল্পনাদৃষ্ট বৃদ্ধ ও তারদীন বাজিকর ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুলি-মাখা হাত-পা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অন্তরের

এক মুহূর্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকেযাবে। এই যুগের শেক্সপীয়র হোমার বাল্মীকি কালিদাসরবীন্দ্রনাথ, তাজমহল Great War এই কলকারখানা, সামাজিক বিপ্লব, এই বিভূতি, শুনু, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাদ্বন্দ্ব, বাদলায় এই ম্যালেরিয়া, বার্নার্ড শ' বা ওয়েন্‌স, ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের প্রতিভা, আমেরিকার ধনীভ্রমণকারীদের এই পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সবসুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার নানাদিকের কাহিনী ইতিহাসে লেখা হবে। প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখি, সমুদ্র, মা-বাপ ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকমপেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামালেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনোকৌতূহল না জাগিয়ে পারে না—পড়বেই সেটাকে সকলে।সকলেই খেলার তাঁবুর বাহির দুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্যভরা খেলাটা সকলের ভালো লাগে, কিন্তু ভালো বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদানও তুলনা হয়—"মশাই কিরকমদেখলেন ?' প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখেপ্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্নভিন্ন। তাই সকলেরই কথাকৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখেদেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু নাকিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্য ভর করে—যেমনসনেটের পিছনে হ্যামলেটের পিছনে সেক্সপীয়ার গুপ্তথেকেও ধরা দিয়েছেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্রজীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাব। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম ?আমার শৈশব কি রকম কাটল ?কোন্ কোন্সাথীকে আমি আনন্দ-মুহূর্তেদেখলাম ?কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করলে ?গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসব না, হয়তো আবার যুগযুগান্তপরে ফিরে আসবো—কে জানে ?বহুকাল পৃথিবীরসন্তানগণের মনে এ লেখা ওই ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদরোরমতো, গভীর মাটির রাশির মধ্যে যাকে খুঁড়ে বার করতেহবে—Great War-এর মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধেরকাহিনীর মতো প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতাশহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতের নতুন-নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ এ সবকাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ, সেইসে-কালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে করতে যেত ! এইরকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময়কাঁদত। ভারী আশ্চর্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তের শ্মশানে জীবনদেবতা বসে বসে শুধুহাসবেন।

॥ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজ অনেকদিন পরে পরিচিত সেই বনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। পশ্চিম আকাশে অপূর্ব রাঙা মেঘের পাহাড়, সমুদ্র, কত বিচিত্র মহাদেশের আবছায়া। সামনের তালবনগুলো অন্ধকারে কি অদ্ভুতদেখাচ্ছে। চারধারে একটা গভীরতা, অপরূপ শান্তি, একটিদূরবিপর্সিত ইঙ্গিত।

এই স্থানটা কি জানি আমার কেন এত ভালো লাগে।যখনই আমি এখানে সারাদিন পরে আসি তখনই আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। এই গাছপালা, মটরলতা, পাখির গান, সন্ধ্যাকাশে বর্ণের ইন্দ্রজাল—এ অন্য জগৎ—আমি সেই জগতে ডুবে থাকতেচাই—সেটা আমরই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া।

নিচের জলাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলা—সেখানে অধুনালুপ্ত হিংস্র অতিকায় সরীসৃপবেড়াতো—সামনের অন্ধকার বনগুলো কয়লার যুগের আদিম অরণ্যানী—আমি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেখি কত রহস্য, কত অপরূপ পরিবর্তনের কাহিনী, কবেকার ইতিহাস ওতে আঁকা, কত যুগযুগের প্রাণধারার সঙ্গীত।

বড় বাসার ছাদে বসেবসে ছেলেবেলার দুই-একটা বড়ঘটনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তোসকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে ! এ আর নতুনকথা কি ?তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। না ভাবলেভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে। নইলে আকাশের ইথারে তোচব্বিশঘণ্টা নানা ভাবের স্পন্দন চলছে, কিন্তু যে বিশিষ্ট ধরনের স্পন্দনের ঢেউ-এর নাম সঙ্গীত তা এত আনন্দদায়কহল কেন ?দিনের পর দিন সূর্য অস্ত যায়, পাখি গান করে, খোকাখুকিরা হাসে—যদি কেউ না দেখত, না শুনতো—তবে মানুষের দৈনন্দিন বা

মানসিক জীবনে তাদের সার্থকতাকিসের থাকত ?কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে যখন এদের যোগহয় তখনই এদেরও সার্থকতা, মনেরও সার্থকতা। মনেরসার্থকতা যে এই বিপুল সৃষ্টির আনন্দকে সে ভোগ করেনিজেও বড় হয়ে উঠলো—আত্মাকে আর এক ধাপ উঠিয়েদিলে—এদের সার্থকতা এই যে এরা সে উন্নতির আনন্দেরকারণ হল।

তাই আমাদের শাস্ত্রেও যোগকে অত বড় করে গিয়েছে।এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগইমানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম ?মানুষ সাধারণত ছোটোহয়ে থাকে—হিংসাদ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দশা। এইভূপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পারে তারমন। মন মুদিখানার দোকান থেকে বার হয়ে পোদ্দারী আড্ডাখোলে এসে। বাইরের অনন্ত নক্ষত্র-জগতের দিকে প্রশান্তজিজ্ঞাসু চোখ চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্মর, পাখিরসুর রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক্‌অন্তরের দিকে—এইহল যোগ। আর সে ছোটো থাকবে না—বড় হয়ে যাবে। ওইঅনন্ত শূন্যের উত্তরাধিকারী সে যে নিজে একথা বুঝবে—কীঅনন্ত আনন্দ তার জন্যে অপেক্ষা করছে তাবুঝবে—অনন্তের দিকে বিসর্পিত তার আত্মাই তখন তাকেবড় করে তুলবে।

এই অবস্থা ঘটেছিল এক সুদূর অতীতে সেই চিন্তাশীলকবির—যিনি জোর গলায় জ্ঞানের চিন্তার স্পর্ধায়বলেছিলেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণংতমসঃ পরস্তাৎ—তিনি বুঝেছিলেন, ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মৃত্যুকে জয় করে বড় হতেগেলে এই অন্ধকারের পরপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষযাঁকে মহর্ষি নিজে বুঝেছেন এবং বুঝে এটুকুও বুঝেছেন যেতাঁকে না বুঝলে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে ওঠবার আর পথ নাই—তাঁকেই জানতে হবে।

যে অমৃত প্রভাতে আদিম ভারতের কোন্ তপোবনে এমহাবাণীর জন্ম হয়েছিল, সে তপোবনের, সে প্রভাতেরবন্দনা করি।

সত্যই তো। অনন্ত বিশ্বকে মানলেই তো মানুষ দেবতাহয়ে ওঠে, তার ওপর এই বিশ্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার ওপারেতার কর্তব্যজ্ঞান যে লাভ করেছে সে অতিমানব—এ বিষয়েভুল নেই।

অতিমানব সে-ই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

মনোরাজ্যে মানুষের অতি অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুব কমই এর সঙ্গে পরিচিত। ভাববারসময় মানুষে পায় না। অথচ এই মনই মানুষের অন্ধকারেপরপারের জ্যোতির্ময় অনন্ত জীবনের বেলাভূমিতে যাবারএকমাত্র অদৃশ্য পুষ্পক রথ।

তোমাকে যে দেশের জঙ্গল কাটতে হবে সেটা ঠিকই; বুভুক্ষিতকে অন্ন দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এটা ভুলে গেলেচলবে না যে চিন্তার দ্বারা তুমি মানবজাতিকে যে আনন্দের স্তরে ওঠাতে পারো, সাময়িক একমুঠো অন্নদানে সে সাহায্য হবে না। নিজে বড় হও তারপর সেই আনন্দের বার্তা পরকে শোনাও—আশার বাণীতে তাদের জরামরণ ঘুচে যাবে।

ভগবান তাঁর অনন্ত জীবনের আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিতে চান এই জন্যেই যে তাঁর মতো উচ্চ জীবের কল্পনা, ধ্যান, বুদ্ধি সকলের হয় এই তিনি চান। তার উপায়ও তিনিকরেছেন, তবুও যদি ছোটো হয়ে থাকা যায় তবে কে কিকরবে ?

সংসারের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে নিত্যকালেরমশালচিদের যাবার পথ, তোমার ব্যাকুলতা দেখে তোমারমশাল তাঁরা জ্বেলে দেবেন, নয়তো অনেকের মতো তোমারমশাল এমনিই থেকে যাবে।

“Let us not fag in paltry works which serve one not and lag alone. Let us not lie and steal. No God will help. We shall find all their terms going the other way Charles Wain, Great Bear, Orion, Leo, Hercules, every God will leave us. Work rather for these interests which the divinities honour and promote—Justice, love, freedom, knowledge, utility.”

॥ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ॥

ভবঘুরের রক্ত পেয়ে বসেছিল, তাই আজ বেরিয়েপড়লাম আমি ও অম্বিকা। সকালে হেমন্তবাবু এসে প্রথম মাইল পোস্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চারধারে সবুজধানক্ষেত, জলাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, দূরে তালগাছেরসারি ও নীল পাহাড়শ্রেণীর সীমারেখা। বারো মাইল চলে এসে রামবাবুর বাড়ি রয়ে গেলাম। সেখানকার অভ্যর্থনা, পান, করঞ্চার সিরাপ

দিয়ে চাটনি কখনো ভুলব না। রামবাবুর বাগানটিতে ছায়াভরা পেঁপে গাছ, ফুলগাছ বড়ভালো লাগল। সেখান থেকে বার হয়ে বৈকালের দিকে কীসুন্দর দৃশ্য ! খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য অস্ত গেল।পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ ! সন্ধ্যার সময়এসে রজৌন থানায় পৌঁছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্যগ্রহণ করলাম। বেশ ভালো লোক—আজকাল এইহিন্দু-মুসলমান বিবাদের দিনে এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয়—মানুষের আত্মা সব সময়ে যেন বাইরেরকুয়াশাতে দিশাহারা হয়ে থাকে না—বরং যখন আপনাআপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে—এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কীসুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না-বসানোটেবিলের ধারে বসে লিখছি—এ সব যেন কোথায় এসেপড়েছি !—সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মতো যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মা'র তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের বাতিক —সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো..কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুবনিয়ে চলেছ—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ি, জ্যোৎস্নাময়পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

॥২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রজৌন থানা॥

কাল রজৌন থানা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তায়মাঠের বাঁকা আলপথে এসে পৌঁছুনো গেল। চানন নদীরকূল থেকে কী সুন্দর দৃশ্যটা ! গুপিবাবুর বাড়ি সেদিনটা থেকেআজ ভোর পাঁচটাতে জামদহের পথে রওনা হলাম।চাননের বাঁধ থেকে দূরে পুবদিকে তালের সারি আড়াল দিয়ে সিদুঁর রং-এর অরুণ আলো আজ দেখা দিচ্ছে—আরো দূরে ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড়—এধারে কাকোয়ারা ওধারে বৌংশীর পাহাড়। পথে কেবলই দূরেদূরে পাহাড়, উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো লাল কাঁকড়েরপথ—চাননের জল স্থানে স্থানে জমে আছে—দূরেদূরেতালের সারি, শাল গাছের বন—রাঙা বালির ওপর দিয়েশীর্ণকায় নির্মল নদী বয়ে যাচ্ছে—সাঁওতাল পরগণার ছায়াময়ী অতি পরিচিত অথচ প্রতিবারেই নতুন-মনে-হওয়া ভূমিশ্রী।

সন্ধ্যা সাতটা। ডাকবাংলোর টেবিলে নির্জনে বসে লিখছি। নিচের চানন নদী, ওপরের পাহাড় অস্পষ্ট অন্ধকারেদেখা যাচ্ছে না—সামনের আমবনের মাথার ওপর তারাউঠেছে—লছমীপুরের ম্যানেজার নদীয়াবাবু ও-অংশেকাছারি করছেন—প্রজারা কথাবার্তা বলছে—এই সুন্দরঅপরিচয়ের মধ্যে বসে মনে হল কতদিন আগেকারগানটা—'বিশ্ব যখন নিদ্রা-মগন গগন অন্ধকার'—ঠিক এইসময়—কলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীয়া—সামনেই পূজাআসছে ষোলোই আশ্বিন। সেবার পূজা ছিল চব্বিশে। সেইসময়কার দূর-কালের সে জীবনটার সঙ্গে আজকার এইনির্জন জীবনের মধ্যেকার এই শালবন বেষ্টিত পাহাড়, নদীতীরের ডাকবাংলো, এই নিভৃত সন্ধ্যা, এই সম্পূর্ণ অন্যধরনের জীবনটা মনে পড়ে। আমি এই রকম অতীতের ও বর্তমানের এই রকম বিভিন্ন জীবনযাত্রার কথা ভাবতেভলোবাসি। বড় ভালো লাগে, কোথায় যেন একেবারে ডুবেযাই। আজ সকালে মহিয়ারডি, লড়কী কয়লা প্রভৃতি অদ্ভুতরকমের গ্রামগুলো ও অপূর্ব পথের দৃশ্য, অম্বিকাবাবুরললিত ডেপুটিকে প্রশংসার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।কাল সকালে লছমীপুর যাবার প্রস্তাব হয়েছে—দেখা যাক।ভগবান আশীর্বাদ করুন, দেওঘরে অবশ্যই পৌঁছে যাব।ডাকবাংলায় জলের বড় অভাব—পূরণ ছুটোছুটি করছে।নাগেশ্বর প্রসাদ, লছমী মুন্সী দেওয়ান শ্রীধরবাবুর নামে পত্রনিয়ে আজ সন্ধ্যায় আসে, ঘোড়ায় করে লছমীপুর চলেগেল। পায়ে এমন বড় ফোস্কা হয়েছে যে ওপথে বড়চড়াই-উৎরাই শুনে একটু ভাবছি। জয়পুর পর্যন্ত মিশিরজীপথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হল।

আমি এই সব তুচ্ছ...খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবসুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওটাকে অনেক দিন পরেআবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।

॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, জামদহ ডাকবাংলো ॥

জামদহ ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে লছমীপুরের পথে কী সুন্দর দৃশ্যটা দেখলাম—চাননের ওপারে পাহাড়ের মাথারওপর প্রভাতের অরুণ-আভা, উঁচুনিচু পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যেমধ্যে ক্ষীণস্রোতা নদী—শালবন, বড়বড় পাথরেরটিলা। গভীর উপত্যকার মধ্যে শালবন-বেষ্টিত লছমীপুরগড়ে এসে পৌঁছানো গেল বেলা আটটাতে। দেওয়ান শ্রীধরবাবুকে কালিবাড়িতে খবর দেওয়া গেল। লছমীপুর প্রাসাদে পৌঁছে দেওয়ানখানায় বসে রইলাম। তার আগেই কালীপদ চক্রবর্তী গুরুঠাকুরের ওখানে চা খাওয়া গেল।সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুর্গম জঙ্গলের পথে হরপুররওনা

হলাম। উচ্চ মালভূমির উপর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। দুধারে খদির, হরীতকী, বয়েড়া, বাঁশ, আবলুশ, আমলকী, কথবেল, বেলের জঙ্গল। প্রথম জঙ্গল পার হয়েদ্বিতীয় জঙ্গলটা শুধু ঘন আবলুশ ও কেঁদ জঙ্গল। এত বড়বড় পাথর যে জুতো ছিঁড়ে বুঝি পাথর পায়ে ফোটে। অম্বিকাবাবু ভারী বিরক্ত হল—এত গভীর বন দিয়ে কেনআসা ?বনের ভালুক, বাঘ ও হরিণ প্রচুর। জঙ্গল শেষ করে রাঙা মাটির উঁচু-নীচু পথ। শালের ও মহুয়ার বন পার হয়েহয়ে অবশেষে জয়পুরের ডাকবাংলোয় পৌঁছানো গেল।ওঝাজি লছমীপুরের কাছারি থেকে নিয়ে এসে আহার ওরন্ধনের আয়োজন করলে।

বেশ কাটল আজ সারাদিনটা। বনোয়ারিবাবুর কথা যেনমনে থাকে বহুদিন। রানীসাহেবার এক ভাই এলেন। বাবরিচুলের গোছা, স্প্রিং-এর মতো কপালে ও মুখের দুপাশে পড়েছে। পকেটে একটা বড় টর্চ যেন একটা পিতলের বাঁশি, হাতে সোনার হাতঘড়ি। রং কালো, আবলুশ কাঠ হার মেনেছে। পথে সাহেবের বাংলো থেকে অম্বিকাবাবু কীসুন্দর ফুল তুলে নিলে। আমি আমলকী, হরীতকী, বয়েড়া তুলে পকেট বোঝাই করলাম।

এতবড় বন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সারাদিনলছমীপুরের আমলাদের উপর অম্বিকাবাবু ও আমি খুব হুকুমটা চালালাম যাইহোক্।

॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, জয়পুর ডাকবাংলো ॥

কাল সকালে উঠে গেলাম পূজা দেখতে আমলাকুণ্ডু কাছারি। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে চা খেয়ে সন্ধ্যারএকটু আগে ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। আসবার সময়নৌকায় উন্মুক্ত গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না কী অমল, উদার...

এই সব জ্যোৎস্নায় যেন কার মুখ মনে পড়ে। এই মৃদুহাওয়ায় তার স্পর্শ আছে...ছেলেবেলাকার সেই নবীনশিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো। সেই পাকাটির গন্ধ, নূতন গ্রামে এসেছি, একটু একটু ভারী ম্যালেরিয়া ভরা যেন হাওয়াটা, উঠানে শিউলিফুল ফুটেছে, সম্মুখে বিস্তৃত অজানা জীবনমহাসাগর। সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখদুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনেপড়ে।

নবীন তাজা প্রভাতে পূজার ঢাক বাজছিল গ্রামান্তরেছাব্বিশ বছর আগে—ছাব্বিশ বছর আগের পাখির দল, ফুলের গুচ্ছ আমার গ্রামের পথে-পথে বনে-বনে অমর হয়েআছে।

এই যে আজ পুজোতে কহলগাঁতে ঢাক বাজে, পঁচিশবছর আগেও কি বেজেছিল ঠিক এই রকম। এই রকমহাসিভরা ছেলেমেয়ের দল...তারা কোথায় সব চলেগিয়েছে। আড়াই শত বছর পরে যারা আসবে তারা অনাগতভবিষ্যতের সম্পদ, তাদের ভেবে মন কেমন মুগ্ধ হয়।

কয়দিন সুরেনবাবুর ওখানে রামচন্দ্রপুরে কাটিয়ে আজ হেঁটে ফিরে এলাম। কয়দিন বেলিবনে বসে বসে কি আড্ডা।কাল বৈকালে চক্রতোর নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কতকথা গল্প হল। আমি, সুরেনবাবু ও মুরলীধর নদীর ধারে ঘাসে বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে বর্তমান সাহিত্যেরপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলে রওনা হলাম। সকালেআটটার মধ্যে ভাগলপুর এসে দেখি মেজ মামা এসেছেন।

॥ ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

সুরেনবাবুর ওখান থেকে গেলাম C.M.S. School-এ।সেখান থেকে এসে নির্জনে বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম।

মানুষ কি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে জন্মেছে ?তার অদৃষ্ট কিতাকে শস্যক্ষেত্রে ফসলের আঁটি বাঁধতে চিরকাল চালিয়েনিয়ে বেড়ায় ?তামাকের দোকানে পোদ্দারের নিক্তিরসাহায্যে, মণিকারের কষ্টিপাথরের সঙ্গে সুপরিচয়ের বন্ধনে ?

যে মানুষের চারধারে গহন অসীম বিস্তৃত, মাথার ওপরেশুন্যে এখানে ওখানে ক্ষণেক্ষণে মিনিটে চার-পাঁচটা করেকত না-জানা প্রাচীন জগতের ভাঙা টুকরোর তারাবাজিধূমভস্মে পরিণত হচ্ছে, যে শান্ত সন্ধ্যায় পাখির গানে নদীর মর্মরে রক্তসূর্যের অস্ত-আভায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে—পাথরে কাপড়ে ক্যান্‌ভাসে বড় সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা বড় ধর্মপ্রচার করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে, নক্ষত্রজগৎকেচিনিয়েছে, ভগবানের সত্তাকে আন্দাজ করেছে—তার অদৃষ্ট কি পৃথিবীর ধূলার সঙ্গে সত্য সত্যই জড়িত থাকবে ?

বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কত দূর দিনে ওই সমস্ত বিশাল নাক্ষত্রিক শূন্যের সে হবে উত্তরাধিকারী। অসীম ব্যোমপথে নবনব গ্রহ তারার অজানা সৌন্দর্যের দেশে তার যে অভিযান এখন সে মনে ভাবতেও সঙ্কুচিত হয়, তখন তাহবে নিত্য

নূতন আনন্দের পুষ্পবীথি। মানুষের ভবিষ্যৎঅদ্ভুত, উজ্জ্বল, রহস্যময়, রাত্রির অন্ধকারে—এই নির্জনে বসে স্পষ্ট তখন দেখতে পেলাম।

সত্যিই আর ভয় করি না, নিরানন্দ বোধ করি না। মানসসরোবরের শতদল পদ্মের মতো এই অনন্তের বোধ আমারপ্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যেন। যখন তখন নীল আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় আমার এ দুর্দিনের প্রবাস অনন্তেরখেয়ার এপারের ঘাট-পারানীর ছোটো কুঁড়েখানা। ওই তোকানে আসছে উন্মত্ত গহন গভীর সাগরের ক্ষুব্ধ উদাত্তসঙ্গীত। কুঁড়ের চাল ভুলে যাই। পুঁইমাচার কথা মনে থাকেনা।লাউশাকগুলো গরুতে খেয়ে ফেললে কিনা দেখবারকার মাথাব্যথা পড়েছে ?

শতজন্মের পারে তাকে যেন আবার পাবো। কোন্দেবতা আছেন যেন জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। তিনি সব দেখেনশোনেন।

কতদিন আগে এই সময়ের সেই গানটা মনে পড়ল:

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।'

॥ ২৯শে অক্টোবর ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

আজ সকালে মাহেন্দ্র ঘাট থেকে স্টিমারে হরিহরছত্রমেলা দেখতে গিয়ে কত কী দেখলাম। ভেটারিনারিহাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধূলায় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসেআছে, ভারি সুন্দর দেখতে। হাতি বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব মেম ধূলি-ধূসরিত হয়ে খেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজঃফরপুর থেকে ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে-ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে-নাচতে এল। টম্‌টম্‌ওয়ালারা চিৎকার করছে—'ধাক্কা বাঁচাও'। একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামীকোথায় গিয়েছে—পাত্তা পাচ্ছে না। সারন জেলারম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

॥ সন্ধ্যা ৬টা, ৭ই নভেম্বর ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট, সোনপুর ॥

জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুঁটুলি হাতে এইমাত্র এসে পাটনায়পৌঁছানো গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর সাজানো অফিস ঘরেটেবিলটাতে বসে লিখছি। গঙ্গায় খুব বড় একটা স্টিমার, নাম মজঃফরপুর। তাতেই পার হওয়া গেল। এপারে ওপারেকি ভয়ানক ভিড়। গঙ্গার ধারে দীঘা ঘাটে ও প্যালেজাঘাটেই এক-এক মেলা বসেগিয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে হু-হু হাওয়ার মধ্যে যখন জাহাজ ছাড়ল তখনকল্পনা করলাম ইজিপ্ট থেকে যেন জাহাজ যাচ্ছে—ওপারে সুন্দরী ইটালীতে। মাঝের ভূমধ্যসাগরের চলোর্মি-চঞ্চল নীলবারিরাশিতে কতকাল আগেকার কত নীলনয়না কনক-কেশিনীসুন্দরীর ছবি যেন দেখলাম, কত ক্লিওপেট্রা, কত হাস্যমুখীতরুণী, ইটালীর মেয়ে, গ্রীসের মেয়ে, রোমের মেয়ে।লোকের ভিড়ে স্টিমারঘাটে নামা যায় না, মালগাড়ির মধ্যেওয়েটিং-রুম, টিকিট দেওয়ার ঘর—যেন যুদ্ধের সময়েরবন্দোবস্ত। আসবার সময় কেবলই মনে হতে লাগল—এইবিদেহ—মিথিলা। এটা ছাপরা জেলা হলেও কালকাসুন্দেগাছের একটা ছায়াভরা ঝোপ দেখে বাংলাদেশের কথাএকবার একটু মনে হল—অবশ্য ওই পর্যন্তই মিল। এদেশের শ্যামলতাশূন্য ভূমিশ্রীর মধ্যে কি আর মরকতশ্যামশ্রীর তুলনাহয় ?সেই মাকাললতা দোলা বৈকালের ছায়াপড়া ঝোপঝাপ, নদীতীর, পাখির ডাক, ঘন বন, লতাপাতার কটুতিক্ত সুগন্ধ, বনফুলের সৌরভ। দীঘাঘাট থেকে গাড়ি ছেড়ে আসবার সময় মনে পড়ল—গিরীনদাদার মুখে শুনলাম দীঘাঘাটেরওপারে প্যালেজা ঘাট। কখনো দেখিনি। এতকাল পরে সেসাধ মিটলো। আরো মনে পড়ল, গিরীনদাদা তাঁর পরিবারবর্গনিয়ে বহুকাল আগে—আজ একুশ বছর আগে—এই পথেপ্রথম বারাকপুর গিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। তারপর আমাদেরযে মুগ্ধ শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে—প্রথম যৌবন, বনগ্রামের বোর্ডিং, গর্দভ উপাধি, বেচু চ্যাটুয্যের স্ট্রিট, মনোমোহন সেনের লেন, পানিতর, কত কাণ্ড ঘটেগিয়েছে। এখন তিনি কি করছেন ?গঙ্গায় আসতে আসতে স্টিমারে চাখেতে খেতে ভাবছিলাম বহুদূরে চাঁপাপুকুরের ঘাটটার কথা।সেই পুকুরঘাটের বাঁধা পৈঠায় এই জ্যোৎস্নালোকে এখন কিহচ্ছে ?সময়ের গতি আগে থেকে কত সামনে চলে এসেছেযে ! আজ যদি এক্ষুনি আবার সেখানে যাই ?সেই বাড়িআছে, সেই পুকুরঘাট আছে, সেই ঘরদোর আছে কিন্তু সে মানুষ কই ?পাটনা যেন হয়ে গিয়েছে বাড়ি। পাটনায় এসেবড় স্টেশনে গিয়ে বক্তিয়ারপুরের গাড়ির সময় জিজ্ঞাসাকরে নিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু ও তার চাপরাশি প্লাটফর্মে পাঞ্জাব মেল ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপরপুঁটুলি হাতে জ্যোৎস্নাভরা রাজপথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মনে হলকী ভবঘুরেই হয়ে পড়েছি। কোথায় বাড়িঘর আর কোথায় সারন জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা করে কত দিনটা

কাটলো। সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর, সেই রাত্রে খালে বেড়ানো, ইসলামকাটি, সেইজয়পুর ডাকবাংলো—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসেরকাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরেগেলাম।

—ও মা—মা ?

দোর খুলে গেল ?—'কে বিভূতি' ?

মণি এল, জাহ্নবী এল, নুটু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালী বাড়ি আছে ?'

ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে। বাড়ি—বাড়ি, কতদিন পরেনিজের পুরানো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি।

কিছুই না অবিশ্যি। ছাতিমফুলের ঘন গন্ধ বেরুচ্ছে।একটা মোটর আসবে—সরে দাঁড়ানো গেল। একটা লোক আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, আপ কাঁহাযাইয়েগা ?ভাবলে বুঝি পথ হারিয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠবাবুরবাড়ি এসে সারাদিনের মেলার ধুলো বেশ করে ধুয়ে আরামকরে অফিস ঘরের টেবিলে বসে লিখছি, কিন্তু কি বিকটমশার উৎপাত।

॥রাত ৯টা, ৭ই নভেম্বর ১৯২৭, পাটনা ॥

একজন পুরোনো আমলের বিদ্যার্থীর পাথর-বাঁধানো শোয়ার জায়গায় বসে লিখছি। কোন্‌বিদ্যার্থীর সুখে-দুঃখেমণ্ডিত ছিল হাজার বছর আগেকার এই প্রাচীন দিনের কোঠাটি—এই বিদ্যার্থীর আমলটি কে জানে ?কোন্‌দেশথেকে শেষ বিদ্যার্থী এসেছিল ?কি ছিল তার ইতিহাস ?কেতার বাপ-মা ?তার আর কোন্‌আনন্দভরা শৈশব-কাহিনী ?কোন্‌দেশে কোন্ নদীর ধারের শ্যামল বন তার কৈশোরকেস্বপ্নমণ্ডিত করেছিল ?কত শুভ অবসরে তার বাপমায়েরকথা ভাবতো—হয়তো তাদের তরুণী নববিবাহিতা বধূরাশতদ্রু, গঙ্গা—অজানা কোনো গ্রাম্য নদীর তীরে তাদেরপ্রতীক্ষায় বিরহাকুল হৃদয়ে দিন গুনে গুনে দেওয়ালে আঁচড়কেটে রাখতো—হাজার বছরের দুয়ার দিয়ে কতকাল আগে—সে সব ছাত্র, সে সব অধ্যাপক, তাদের বাপ-মা কোথায়স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। অদূরের রাজগৃহের প্রাচীনকোন্ রাজার কোষাগার আজ অন্ধকার রুদ্ধবায়ু ভূগর্ভেরকুক্ষিতে গুপ্ত, ইট, মাটি, কাঠের স্তূপের আড়ালে সে সবদিনের কথা বসন্তের ফুলের মতো ঝরে গিয়েছে। এদেরও সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের বাঁশিও আজ হাজার বছর ধরে এই নির্জন প্রান্তরের হাওয়ায় নিঃসীম শূন্যে কানে কানে তাদের রহস্য-কাহিনী গান করে এসেছে।

॥ ১১ই নভেম্বর ১৯২৭, নালন্দা ॥

একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গর্বদৃপ্ত রাজধানীর উপর দিয়েহেঁটে যাচ্ছি। দুটো রাজগিরি মাটির তলে অন্ধকারে চাপাপড়ে আছে। কেবলই মনে হয়, এত প্রাচীন দিনের রথ, সৈন্য, কোলাহলভরা জয়দৃপ্ত পথ, চৈত্য, স্তূপ, কত রাজনৈতিক, কবি, সেনানায়ক, মন্ত্রী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, শ্রেষ্ঠী, পুরোহিত যেন মাটির তলে কোথায় চাপা রয়েছে। তাদেরসমাধির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাভারতের যুগেরকথা, তার ছবি কতকাল আগে ভীম বলে যদি—কোনোকালেথেকে থাকেন, তবে তিনি এসেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার দিনের জানালায় বসে দুপুর রোদেএই জরাসন্ধের কারাগারের কত ছবিই যে দেখেছি !

আমি বেশ মনে ভাবছি—পুরানো সে যুগের এক তরুণসেনানায়ক মগধের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ-জয় করে ফিরেএসেছিল, তার বাড়ি ফিরে আসা, তার বিরহী মনটার তৃষ্ণা—আবার মা, বাপ, ভাই-বোন ও নববধূর সঙ্গেমিশবার যে আকাঙ্খা—হাজার হাজার বছর পরে যেনআমার মনে এসে বাজছে। ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো তারাকোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কতকাল আগে।

পাহাড়ে-পাহাড়ে জংলীবাঁশের বনে শেষ মধ্যাহ্নের ম্লান রোদের মধ্যে, বুনো পাখির কাকলীর তানে, কতকাল আগেকার মিলিয়ে যাওয়া আশা, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, প্রেম ও স্নেহের তান করুণ হয়ে ওঠে !

এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঘন জঙ্গলে বসে আছি ময়না-কাঁটা, বুনো বাঁশ, সেঁয়াফুল, কত কি বুনো গাছপালা। কি নির্জন স্থান—এই পর্বতবেষ্টিত স্থানে বোধহয় প্রাচীন রাজগৃহ ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাব ওচিন্তাদৈন্য দেখলে মনে বড় কষ্ট হয়। এত নিকটে এমন স্থানআছে—প্রাচীন ব্যাবিলনের মতো গৌরবশালী ধ্বংসস্তূপযার—তার কেউ একটা ভালোরকম সন্ধানও দিতে পারলে না বক্তিয়ারপুর থেকে !

অনেক কাল পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। College days-এ তার মধ্যে gifts ছিল। কিন্তু interestsবড় limited হয়েগিয়েছে। তার পরে সংসারে পড়ে অর্থার্জনও তুচ্ছ যশাকাঙ্ক্ষায় তার সব মন, বুদিয়া, শক্তি ব্যয়িতহয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্বে সে দীপ্তমুখ বালককে এই অকাল-বৃদ্ধ, অপ্রসন্ন মুখ নিস্তেজ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যেখুঁজে পেলাম না।

মনে বড় কষ্ট হল। এই রকম করেই জগতে লোকেরজীবন ছাই-চাপা পড়ে যায়। প্রথম কারণ—কল্পনার অভাব, দ্বিতীয়—তারা দিক্‌চক্রবালের দূরসীমার প্রান্তের সবুজবনরেখার সন্ধান পায় না, মাথার ওপরকার ছাদেরকড়িবরগায় তাদের অনন্ত আকাশের ছায়াপথকে আড়ালকরে রেখেছে। জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন তার সন্ধানই মেলে না। হই-হাইবাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে সুযোগ দেয়নি এরা। সে বেচারি সুযোগ খুঁজেখুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অসাফল্যের পথবেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। তারপরই আসছে সাহেবকে প্রসন্নকরে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা। কোন্‌ফন্দিতে বেশি ব্রিফ্‌জোগাড় করতে পারা যাবে সেই ভাবনা। এর ওপর মেয়েরবিয়ে তো অবিশ্যি আছেই।

কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে খবর রাখে মগধ ! আর কে খবর রাখে এই ভূমি পবিত্র হয়েছিল সেইপ্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেবের পূত চরণরেণু স্পর্শে। তারাশুধু তাড়াতাড়ি ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে বিষ্ণুমূর্তির পায়ে একটা ফুল ফেলে দিয়ে আহার জোগাড় করবার জন্য ছোটে। এই বিশাল পাহাড়শ্রেণী, এই নির্জন স্নিগ্ধ বনভূমি, এই ভূগর্ভস্থ প্রাচীন দিনের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যেররাজধানী তাদের মনে খোরাক যোগাতে পারে—তারা তারউপযুক্ত নয়।

॥১৪ই নভেম্বর ১৯২৭, রাজগিরি ॥

কালীর সঙ্গে ৫/৬টা দিন বেশ কাটল। সময়ে-সময়েপুরোনো দিনের ছেলেবেলাকার গল্পসল্প করা যেত। রাজগৃহবেড়াতে গেলাম, নালন্দা গেলাম—যেমন বাল্যকালে আমরাদুজনে কুঠির মাঠে, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে যেতুম, তেমনি। বাবার মুখের গান পুরোনো সুরে বহুদিন পরে তারমুখে শুনলাম। আবার সেই সব শৈশবের আনন্দ ফিরেএসেছিল।

কাল সকালে পাটনা গিয়েই বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে শুনলামযে এখনই ভাগলপুর যেতে হবে। তখনই লুপ্‌Express-এ রওনা হলাম। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে ওদের মশারি ও গায়ের বোতাম ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ সকালে ইন্সিওরেন্স-এর এজেন্ট ভদ্রলোক বলছিলেন কাল নাকি অমরবাবুর বাসা থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব নয়, কালকের দিনটা ছিল খুব ভালো। আমি কাজরা স্টেশনের বাঁকটায় এসে ট্রেন থেকে ঠিক বেলা চারটের সময় পূর্ব-উত্তর কোণে দিকচক্রবালে মিছরিরপাহাড়ের মতো শুভ্র, ঈষৎ সোনালী রং-এর একটাপর্বতশ্রেণীর মতো লক্ষ করছিলাম বটে। হয়তো সেটা মেঘ, কিন্তু হতেও পারে হয়তো বৈকালের নির্মুক্ত আকাশে দূরথেকে হিমালয়ের তুষারশিখরই চোখে পড়ছিল।

Hugh Walpole-এর কথাটা বড় মনে লেগেছিলসেদিনকার Englishman-এ:

“The establishment of a contemplative order. Anyone above 50, should retire to a quiet valley, free from motors and radios and spend some time in silence and contemplation—amidst green woodsand quietness of chirping of wild birds beneath a blue sky—if possible by the side of a running brook.”

চমৎকার কথা ! জগতে এখানে ওখানে সত্যিকার মানুষেরা সব আছে, যাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারী খাঁটি কথা সব শুনতে পাওয়া যায়।

॥১৬ নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

অমরবাবুর ওখান থেকে গল্প করে ফিরে কেদারবাবুর বাড়িতে রামায়ণ গান শুনে বাসায় ফিরছিলাম।

পথে আসতে-আসতে অনেক কালের একটা গল্প মনেপড়ল। আমার পলিসির অধ্যবসায়ের ঘটনাস্থল ছিল নবীনচক্কোত্তির বাড়ির এদিকের এড়ো ঘরটা, এই গল্পটার ঘটনাস্থলও ছিল তাই। কোনো এক ভগ্নপোতে মহাসমুদ্রের কোন্‌অংশ জানি না অন্য সব যাত্রী, মাঝি-মাল্লাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশিষ্ট একটামাত্র লাইফবেল্ট পরতে যাচ্ছেন—এমন সময় তার চোখে পড়লো জাহাজেরএক কোণে এক ক্ষুদ্র অপরিচিত বালক শীতে ভয়ে ঠক্‌-ঠক্‌করে কাঁপছে। সে একজন stowaway—লুকিয়ে জাহাজেচড়ে কোথায় যাচ্ছিল—কতদিন খায়নি, ভয়ে ও অনাহারেমৃতপ্রায় হয়ে

পড়েছে। মহানুভব পোতাধ্যক্ষ তাকে তাঁরজীবনরক্ষার শেষ উপায়টা দিয়ে মৃত্যুর জন্য নিজে প্রস্তুতহলেন এবং অল্পক্ষণেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের গর্ভে পোতসহ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

সেই কাপ্তেনের ছবিটা বেশ দেখতে পেলাম। পর্তুগালেরকি স্পেনের কোনো দ্রাক্ষালতার বনের ধারে বসে নীলনয়নবালক আপন মনে নির্জনে দূর দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত—আটলান্টিক্‌পার হয়ে অজানা দেশের ধনভাণ্ডারলুট করে তাঁর দেশের নাবিকেরা প্রাচীনকালে দেশকেধনশালী করে ক্ষমতাশালী করে রেখে গিয়েছে—তারওমনে মনে ইচ্ছা যে সে-ও একদিন সেইরকম হবে। কর্টেজকি পিজারোর মতো রাজ্যস্থাপয়িতা দিগ্বিজয়ী বীর নাবিক। তারপর তার দরিদ্র পিতামাতার কুটিরে পোড়ারুটি খেয়েশুয়ে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে দূরের স্বপ্নে আকুল হয়ে উঠত।পিতামাতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কেউ ভালো খেতে পায় না। শিক্ষার সুযোগই বা কে দেয় ?একদিন স্বপ্নেরসৌন্দর্যে আকুল হয়ে বালক বাড়ি থেকে পালিয়ে চলেগেল। তার কেউ খোঁজখবর করলে না। ক্রমে সকলে ভুলেগেল তাকে।

কেবল তার মা তাকে মনে রাখলে। ধর্মমন্দিরে উপাসনার সময় সঙ্গীহীন, সেই নীলনয়ন পলাতক ছেলেটিতার ছিল নিত্যসঙ্গী। কত নির্জন রাত্রের চোখের জলে, রোগশয্যায় বিকারের ঘোরে তার কিশোর মূর্তি চোখেপড়েছে। মা যখন মারা গেল, ছেলে তখন স্বপ্নকে সার্থকতারমধ্যে পেয়েছে।

কত কাল চলে গিয়েছে—কত দেশের কত অদ্ভুতজীবনপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে সে বালক এখন প্রৌঢ়পোতাধ্যক্ষ। বিবাহ সে করেনি—বিশাল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্গীত তার জীবনের বীণাকে চিরকাল রুদ্রতালেবাজিয়ে এসেছে। সংসারের কোনো বাঁধন নেই তার।অচিনের অনন্ত পথ ছেলেবেলাকার মতোই তার সামনেতবুও বিস্তৃত।

ভীত, জড়সড়, ক্ষুদ্র বালককে দেখে সে মরণের রাত্রেতার নিজের দূর শৈশবের কথা মনে পড়ল। এই রকমঅবোধ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক ছিল সে, যখন প্রথমঅজানার টানে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বালকও আজ সেরকম বেরিয়েছে, কিন্তু হতভাগ্য প্রথম বারেইজীবনকে বিপন্ন করে বসেছে। বালকের জীবনের বিস্তৃততরসুখ আনন্দকে প্রসারলাভ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যেসে নিজের লাইফ-বেল্ট তখনি খুলে তাকে পরিয়ে দিয়েবললে—"বন্ধু, তোমারই মতো বয়সে আমিও বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে—তুমিবাঁচো, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

আজ এই রাত্রে পড়াশুনার একটা অদম্য পিপাসা মনের মধ্যে অনুভব করছি। এক লাইব্রেরি বই পাই, সব বিষয়েখুব বসেবসে পড়ি। বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস—দেশবিদেশেরকবিদের ও ঔপন্যাসিকদের বই পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। অন্য ব্যাপারে নষ্ট করে কি করব ?শুধু পিপাসা—আমার এ পড়াশুনার পিপাসা দেখছি বিকারেরতৃষ্ণার মতো। যত জল খাই, আরো জল, আরো জল।ততই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

॥১৭ই নভেম্বর ১৯২৭ ।।

এইমাত্র থিয়েটার দেখতে যাব। টিকিট কিনেছি। বড়বাসার নির্জন ছাদটার নির্জন শীতসন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুরদিকে চেয়েচেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকার ঘন তীরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলোজ্বালাতে যাই—নিভে যায় বারে বারে"—সেই শীতেরবিষণ্ণ প্রভাতে গানটির কথা মনে আসে ! সেই সন্ধ্যা—সেইদোকানে।

যাক সে কথা। আকাশের দিকে এখানে ওখানে-দু'একটানক্ষত্র জ্বলছে। দেখে মনে হল এই পৃথিবীটুকু কেবলজানা—তার ওপারে অনন্ত অজানা মহাসমুদ্র। কোথায় Sirius, Vega, Spiral Nebula, বহির্ষদ পিতৃলোক।মরণলোকের যাত্রীদের যাতায়াতের বীথিপথ। অনন্ত, অজানা সেই ছেলেবেলার রাজু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়পড়তে যাবার সময় চারিধারের বাঁশবনে যেমন অজানা দেশলুকিয়ে থাকত—গুপ্তধনের দেশ তেমনি ঠিক।

ক্লাব থেকে আভাসবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতেগেলাম। অমরবাবুকে দেখলাম—কথাবার্তা হল। "ষোড়শী" বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। কিন্তু একটু সন্দেহ নিয়েইগিয়েছিলাম মনেমনে। বই বেশ ভালো লাগল। ওরকমনূতন ধরনের কথাবার্তা বাংলা স্টেজে বোধহয় বেশি নেই।

পরদিন বড় বাসার ছাদে বসেবসে সন্ধ্যাবেলাভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভালো জিনিসপেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেইজন্মেছিলাম। এই তো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই

পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপঝাপ। বড় ভালোবাসি তাদের, বড়ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসিআমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমারবাঁশবন, শেওলা ঝোপ, সোঁদালিফুল, ছাতিমফুল, বাবলাবনকে। সে ছায়া সে স্নিগ্ধস্নেহ, আমার গ্রামের সে সবঅপরাহ্ণ—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।...তারাই যে আমার ঐশ্বর্য। অন্য ঐশ্বর্যকে তাদের কাছে যেতৃণের মতো গণ্য করি।

এই শীতের অপরাহ্ণ, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনেলেগে থাকে তখন শৈশবে কতদিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসাইছামতীর তীরে নির্জনে বসে বর্ষার ভাঙনের শিমুলতলারদিকে চেয়ে জীবনের-মরণের পারের এক রহস্যময় অজানাঅনন্তলোকের স্বপ্ন আবছায়াভাবে মনে আসতো কতদিনচেয়ে থাকতাম শিমুলতলার নিচে, লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়ি, ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোরজায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস-উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃতমাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

তারপর সত্যিসত্যি কত ভালো জিনিসই পেলাম।গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়িতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজস্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বারকরে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোরকথা মনে হয়ে পুলক হয়।

তারপর চাটগাঁয়ের সুন্দর দিনগুলো জানি ! ফরিদপুরেরসত্যবাবুদের বাড়ি। তারপর সুন্দর জীবনের period চললো। সেই নয় বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে কি ভালোইবাসি !তার সেই মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না, সেই মক্কামদিনায়যাওয়া বালিশ, সেই "শরৎ তোমার অরুণ আলোরঅঞ্জলি" !

এ সব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে।আরো কত-কত আসবে। এও ঠিক, একদিন সব বন্ধ হয়েযাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে, বাবলা বনের ছায়ায়, ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে, নীরবশান্তির কোলে এ জীবনের দেওয়া-নেওয়া সব শেষ হয়েযাবে। কিন্তু তাতে কি ?মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ওই দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন্অনন্ত লোক অনন্তকালের পথিক, যাত্রী সে—তার যাওয়া-আসা কিফুরোবে হঠাৎ ?

আমি এই যাওয়া-আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি।হয়তো একবার এসেছিলাম দূর কোনো ঐতিহাসিক যুগে—হয়তো রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্যসাগরের নীলজলের তীরের কোনো সম্ভ্রান্ত ধনীরপ্রাসাদে। হয়তো প্রাচীন গ্রিসের গৌরবের দিনে গ্রিকবীরহয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, আলেকজান্ডারের সৈন্যদলে ঢালতলোয়ার ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছি—নয়তো কোনো পাহাড়ের ছায়ায় বসে এইরকম স্বপ্ন দেখতাম—নয়তোইংলন্ডে কি ফ্রান্সে কোনো অবজ্ঞাত গ্রামে কৃষকবালক হয়েজন্মেছিলাম—এলম্‌কি ওক গাছের নীচে বসে বসে ভেড়াচড়াতাম—কে জানে ?

আবার বহুদূরে জন্মান্তরে হয়তো ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশুনয়নদুটি মেলব। পাঁচশো বছর পরের পাখির গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোনোঅজানা দেশের অজানা পর্ণকুটিরে কোনো অজ্ঞাত দেশেরঅজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটবে—অনাগত মা ও বাপের স্নেহসুধায় মানুষ হব।পাঁচশো বছর পরের অনাগত কত বালক-বালিকাতরুণ-তরুণী, কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা, লোকের সঙ্গে সে কত পুলক ভরা পরিচয় !

কেবলই মনে হয় সৃষ্টির যিনি দেবতা এত দয়া তাঁরকেন ?এই অনন্তের সুধা-উৎস মানুষের জন্যে তিনি কতকাল থেকে খুলেছেন ?এই অন্ধকারে তবু হাতজোড় করে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

॥২৮শে নভেম্বর ১৯২৭ ॥

মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে ?জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের ঝঞ্ঝনায় সম্রাটসম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালি পোশাকের জাঁকজমকেদরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আমগাছেতাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখি দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়াকিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায়ঢেউ বইয়েছিল। দু'হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই—থাকলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাটমেণ্টুহোটেপ, জুলিয়াস সীজার, থিয়োডোসিয়াস এবং তাবৎসম্রাট পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরাশৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু গ্রিসের ও রোমেরযব ও গমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ্ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপেরছায়ায়-ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরেসকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস

আমিজানতে চাই। হোমার ভার্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েউঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথায় আমি জানি না কিন্তুউত্তরপুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হততারা একথা ঠিক।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদেরপাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে সরে যায়, সারিবাঁধাবর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থেরছোটো বাড়ি নজরে আসে, অজ্ঞাত কোনো লেখকের জীবনকথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা একটুকরো পাত্র, প্রাচীনইজিপ্টের কোনো কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলেছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙা ফাটা মাটির তলায় চাপা-পড়া মৃন্ময়পাত্রের মতো পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে।তারপর কল্পনা—আর কল্পনা।

প্রস্ফুট সর্ষে ক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীল আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে আবার সেই দূরকালের পূর্বপুরুষদের কথা ভাবি।

বর্তমানে একদল লেখক উঠেছেন, যাঁরা ইতিহাসের এইফাঁক পূর্ণ করবেন। তাঁরা ছোটো গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, জীবন-চরিত লেখকের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম দ্রষ্টা তাঁরা—দৈনিক লিপি-লেখক—এঁদের দল। চেকফ এইচ্.জি.ওয়েলস্, গোর্কি, ব্রেট হার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজামুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের লেখা ভবিষ্যৎ যুগেরপুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবংঅত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমান্সলেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবে না—তাঁদের কল্পনারউল্লাস, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝেমাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি, কোন্ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর ফেলতেপেরেছেন ?

কিন্তু আরো সূক্ষ্ম আরো তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই।আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষমানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটি কোটি মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবেএই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েওখাঁটি ইতিহাস।

এই যুগযুগ ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাওনয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্মহা ঔপন্যাসিকেরকলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস। অধ্যায়ে-অধ্যায়ে ভাগকরা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্বিস্মৃত যুগেরআটলান্টিক জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোনোঅধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা, তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগশিশুর মৃত্যুতে যেবিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হল তাও এর এক অধ্যায়েরকথা। ওই যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্য নয়। মানুষ শুধু মাটি-পাথর খুঁড়ে, এতে ওতে জোড়াতালি দিয়ে, দস্যুবৃত্তিকরে লুকিয়ে-চুরিয়ে এর এক আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেঁটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।

।। ৩০শে নভেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর ।।

সন্ধ্যার আগে লাখপতি মণ্ডলের টোলার পিছনের কুণ্ডীটাপার হয়ে ঘোড়া কাশজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটিয়েরামজোতের পুরানো বাগান দিয়ে নিচের কুণ্ডীটাতে গেলাম।লাখপতিদের টোলার মাথার উপরে রাঙা টকটকে লাল সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় কাশজঙ্গলের ধারে ধারে কেমন সোঁদা-সোঁদা ঠাণ্ডা গন্ধ। কুণ্ডীটার ধার দিয়ে খুব জোর করে ঘোড়া ছুটিয়ে কুণ্ডী পার হয়ে সামনের যেকুণ্ডীটা, যেটার ধারে সেদিন লাল হাঁস বসেছিল—আমি যেতে না যেতেই উড়ে গেল,মারতে পারিনি—সেইকুণ্ডীটার ধারে গেলাম। পাখি কোথাও কিছু নেই। দূরপ্রসারীঈষৎ অন্ধকার কাশজঙ্গলের মাথার উপর তাকিয়ে ভাবছিলাম—নয় বছর আগে ঠিক এমনি দিনগুলোতেবারাকপুরের বাড়িতে সেই হরি রায়ের বাড়িতে বসা-হরিপদদা—সেই শোকের দিনগুলো আজ কোথায় কিহয়েগিয়েছে।

জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখলাম দুটি হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে কিন্তু বন্দুকটা আনিনি। কতকগুলি Snipe-ও ছিল, এদেশে বলে চাহা—বন্দুক থাকলে সুবিধা হত।

তারপর খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

আজকাল ঠিক দুপুরে সন্ধ্যার আগে একবার করে বসিকাছারির পেছনের কাশজঙ্গলের ধারে সর্ষেক্ষেতের পাশে। প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের গন্ধে সেই ছেলেবেলার বড়দিনের বন্ধে বনগাঁ থেকে বাড়ি আসার কথা মনে পড়ে। বড় আনন্দ হয়এই মাটি, এই আধশুকনো, আধ সবুজ কাশবনের স্নিগ্ধছায়া, তারই ধারে এই হলুদ রং-এর গন্ধে ভরপুর সর্ষেক্ষেত, এই নির্জনতা একেবারে মাটির মায়ের কোলেবসে থাকা। এই আকাশ—আমার জানলা দিয়ে রোজসন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া, দূর পুব আকাশের orion-এর pointer-টা বড় মুগ্ধ করে দেয় আমাকে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্জন কাশবনের রহস্য আমার প্রাণেএসে লাগে—জীবনটা কি ?কি গহন গভীর গোপনতা—কিযাওয়া আসার গতিছন্দ !

কাল সন্ধ্যায় টেবিলটায় বসে লিখতে-লিখতে দূর পুবআকাশের একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ভাবলাম—ওই সবনক্ষত্রের বা তার পাশের গ্রহের অজানা জীবনযাত্রা, আমাদের কাছে একেবারে গোপনতায় ঢাকা। কে জানে ওরমধ্যে কি প্রাণীদল, কি জীবনের গতি। এই আমি যে অত্যন্তবাস্তব জীব এই টেবিলে বসে লিখছি—আর ওই জ্বলজ্বলেতারাটার মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যের ব্যবধান—কোনোকালেইএ ব্যবধান পৃথিবীর জীবে ঘোচাতে পারবে না বোধ হয়।কে জানে ওদের জগতে কিরকম জীবনযাত্রা ?গভীর রাত্রেরামচরিত যখন আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বাইরে উঠেনির্জন বনমাঠের ওপরকার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়েথাকি। বহু দূরপারের গভীর কোন্ গহন রহস্য ধীরে-ধীরেআমার মনে নেমে আসে—সে বলা যায় না, লেখা যায় না।জীবনের গভীর মুহূর্তে সে সব—কেবল তা মনে এই সত্য আনে যে-জীবন ওই দূর ছায়াপথের মতো দূরবিসর্পিত, একটু শেষ নয়। এখানে আরম্ভও নয়—সুদূর কোথা থেকেএসে সুদূরের কোন্পারের দিকে তার ডিঙ্গার মুখ ফিরানো।

প্রাণের মধ্যে এই অনুভূতিটুকু যেন সকলের সত্য হয়ে ওঠে।

॥ ২রা ডিসেম্বর ১৯২৭ ॥

গভীর নির্জন কাশবনের মধ্যের কাছারি ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রানি সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি, কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বেরকাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতন, কতঅত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্যে কত প্রাণদেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্তিরা আবার গিবনের পাতায়ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়ন নিষ্কলঙ্কাতরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা বাপ কোথায় সবচলে গিয়েছে ! অনন্ত কাল-মহাসমুদ্রে কোন্ অতীতকালেছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে—কোথায় ! এই গভীররাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিল্ডো, রুফাইলাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসেরঅর্থলিপ্সার কথা, অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল ! বিশ্বস্তবন্ধুর গুপ্তকথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি, নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার ?

এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতাদেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশকরবার জন্যেই কি রুফাইলাস কাউন্ট জন অত করেনির্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল ! সে করুণা কাউন্ট জনেরজন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইলাস ও তার ধন-লিপ্সার জন্যে।কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্যলিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন সে বিষয়ে আমিতত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এইমহাকালের মিছিলে, এই সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি—তৃণের মতো স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ারদিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

দু হাজার বছর আগের সে সব মানুষের মতো—তাদেরইতিহাস-লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলন্ডের কোনপ্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়েআছে জানি না। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্নহয়ে যাব।

সন্ধায় শান্ত বাঁশবনে, দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্তিদের মতোসব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্তমান, সব। এইঅপূর্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তাণ্ডব নৃত্যছন্দ যুগ যুগধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য, এ কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলেদিয়ে আপন

মনে কোন্বিশাল অন্তরের মৃগঙ্গের গম্ভীরবোলের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে—দিকেদিকে যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিল্‌ডো, রুফাইলাসের দল ও তাদের কড়িরপুঁটুলি ফেনার ফুলের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশমথিত হয়ে যাচ্ছে তার বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁরমহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাসভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে...অনাহত শব্দের মতো তা সাধারণমানুষের শক্তির বাইরে।

সে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেননি। শুনেছিলেন সাধু জন্‌ক্রাইসোটিন। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়েদূর সিরীয় মরুভূমির নির্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকচক্ষুরঅন্তরালে তিনি ধ্যানজীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্যচ্ছটায় সিরীয় মরুভূমির বালুরাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলারস্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।

॥রাত্রি বারোটা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর ॥

সন্ধ্যার পর আমার নিজের ঘোড়াটায় চড়লাম। প্রথমেঘোড়াটায় চড়ে বেরুতেই সেটা বড় বদমায়েশি শুরু করে দিল। রামজোতের বাসায় চালের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় ঠেসে ধরেছিল আর কি। বেগতিক বুঝে অন্য কোনোদিকে না গিয়ে বাঙালি ধাপের দিকে গেলাম। সেখানে কারা মাছ ধরছে। অনেক পাখি বসে আছে, কিন্তু কয়দিনই উপরি উপরিপাখি মারতে গিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার দরুন শিকারে আরস্পৃহা নেই। বাংলা ধাপের ওপারের জঙ্গলের মাথায় সূর্যঅস্ত গেল—দিয়াড়ায় সূর্য-অস্ত একটা দেখবার জিনিস—কিরাঙা টক্‌টকে আগুন রং-এর সোনা! সন্ধ্যা হয়েগিয়েছে—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিলবরের টোলায়বাসবিরিদের বাসা পার হয়ে চললাম। বন্না মণ্ডলের টোলাযেতে যেতে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। লোধাই টোলায় যখনগিয়েছি, তখন তারা আগুন পোহাতে বসেছে। তারপরই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢোকালাম। ঘন জঙ্গলে ভালোকরে জ্যোৎস্না ঢোকেনি, খাটো খাটো বনঝাউ গাছগুলো শিশিরে ভিজে গিয়েছে। জঙ্গলে ক্রমে ঘনতর হল, পথ শেষহয়ে এল। আগে আর বছর যেখানে রাঁইচি-খামার লুটহয়েছিল, সেইদিকে ঘোড়া নিয়ে চলা গেল। অবশ্য একটুএকটু ভয় হয়েছিল। বনে শুয়োর বাঘের ভয় খুব। কাল অনেক রাত্রে কেউ ডাকছিল। ভয়কে জয় করবার জন্যে জিদ্ করেই আরো ঘন নির্জন বনে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিলাম। পরেঅনেকটা গিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলাম। দূরে পূর্বদিকেচেয়ে মনে হল আমাদের বাড়ির নির্জন ভিটায় বাঁশবনেরফাঁক দিয়ে একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে—এই শীতকালেকবে দোলাই গায়ে দিয়ে শৈশবে পাটালি চালভাজা খাবারলোভে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছি। তারপর লোধাইটোলা ছেড়ে সোজা পথটায় ঘোড়া ছুটলো। চতুর্দশীর মাঠভরা ধপধপে জ্যোৎস্না, নির্জন মেঠো পথ—হুহু করেঘোড়া ছেড়ে একেবারে বন্না মণ্ডলের টোলার কাছটায় এসে পড়লাম। মনে পড়লো ১৯১৮ সালের এই সময় এইদিনগুলোতে হরিপদদার সঙ্গে দাবা খেলে সকাল বিকালকি করেই কাটাতাম। পাশের মাঠটায় অনেক লাল হাঁস (চক্রবাক্) কাল সন্ধ্যায় বসেছিল। রামচরিতের সঙ্গে মারতেএসেছিলাম, কিন্তু গুলি করতেই সব পালিয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে শুধুই ঘোরা হল। ইউনিভার্সিটিরসিল্কের চাদর ওড়ানো মেয়েলি কলকাতার ছেলের সঙ্গে ওএই ইংরাজ explorer যুবকদের কী তফাত !

ওই রকম হওয়া চাই—দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসিক ঘোড়সওয়ার।বনে জঙ্গলে মেরুপ্রদেশের তুষারভূমিতে কাটিয়েএসেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে—ভয় নেই। অথচ স্রষ্টা—Out of chaos he has created something. ভগবানের তেজ, যৌবনদীপ্তি, জ্ঞান। অথচ কলকাতায় যখন ক্লাবে গিয়ে বসবে তখন শৌখিন খুব। সে-ও সিল্কের চাদরওড়াবে, বেয়ারার হাতে কোকো বা কফি খাবে।

আজ সতীশের পত্র পেয়েছি বহুদিন পরে। সে দরজিরকাজ শিখতে কোন্স্কুলে পড়ছে—কিছু সাহায্য চায়।কতকালের কথা—সেই জাঙ্গিপাড়া—সেই ঠিক এই সময়েজাঙ্গিপাড়া রেলস্টেশনের মধ্যে রাখালবাবুর সঙ্গে বসে গল্পকরা, সেই ত্রিপুরাবাবু, বুড়ো চক্রবর্তী মশায় চালকড়াইভেজে আনতেন—সতীশ দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে আসত, আররুটি করে নিয়ে আসত। সেই একদিনের ছুটিতে কোথাওনা গিয়ে জাঙ্গিপাড়াতেই কাটানো গেল। লাইনের ধারে চেয়ারে বসে তেল মাখলাম—সে এক জীবন কেটেছে।

মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতিসব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত পড়ার মতোদৈবাৎ কোন্পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটাবড় পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগে একটাদিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরেআসে। এই রকম এল কাল—হঠাৎ অনেককাল আগে রংপুরথেকে ফিরে আসার পথে রাণাঘাট এসে অমৃতকাকার সঙ্গেযে রাণাঘাট Exhibition দেখতে গিয়েছিলাম খামোকা সেইদিনটার

কথাই মনে পড়ে গেল! সেই "সাজাহান" থিয়েটার হবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে তার বিজ্ঞাপন—সেইচানাচুর ভাজা কিনে খাওয়া—সেই বাবার পাতানো মায়েরবাড়ি যাওয়া—স্পষ্টভাবে সব কথা মনে এল।

আজ আর একটা আজগুবি কথা মনে এল। হঠাৎকলকাতায় গিয়ে প্রসন্নদের বাড়িটা কি মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ির সামনে সেই শৈশবের মাঠগুদামটা ভাড়া নিয়ে বাস করা যায় ?করব নাকি ?পঁচিশ বছর পরে আবার যদি সেইপঁচিশ বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসে তবে তো !

॥ ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৭ ॥

কাল রাত্রে সর্বগ্রাস চন্দ্রগহণ ছিল। অনেক রাত পর্যন্তআমি গোষ্ঠবাবু দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখলাম। খুব যখনঅন্ধকার হয়ে গেল তখন গিয়ে শুয়ে পড়ি। আজ সকালে উঠে প্রথমে জিনিসপত্র রওনা করে দিলাম। পরে খাওয়ার পরে ঘোড়া করে রওনা হলাম, মিত্র সঙ্গেসঙ্গে এল। লোধা মণ্ডলের টোলা ছাড়িয়ে এসে কাদা ততটা নেই, সেদিন অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যতটাছিল—পরে এসে পরশুরামপুর ঘাটে পৌঁছানো গেল।কাছারিটা চিনতাম না—অড়হরের ক্ষেত বেয়েবেয়ে এসেকাছারি পৌঁছানোগেল। গত বৎসর মোহিনীবাবু ধামশ্রেণীগিয়েছিলেন—সেই ধামশ্রেণী। শৈশবের কত স্মৃতিমাখানো! জিজ্ঞাসা করলাম, রানী সত্যবতীর ঠাকুরবাড়িতে আজকাল রাতের সে রকম ভোগ হয় কিনা—সেইমজাপুকুরটা আছে কিনা। সেখান থেকে ঘোড়া ছেড়ে কারুমণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসতে-আসতে কলবলিয়ার ধারের পথ বেয়ে দেখি বনোয়ারি পাটোয়ারি আজমাবাদ চলেছে।তারই হাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বড় খামখানা দিয়েদিলাম। কলবলিয়ার পথ বেয়ে বেয়ে কখনো জোরে কখনোআস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ভগবানদাস-টোলার মধ্যে এলাম।পাছে পথ ভুলে যাই, এইজন্য সব সময়ে ডানদিকের বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার দিকে নজর রাখছিলাম। সে টোলাছাড়িয়ে সোজা কলবলিয়ার ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কলাই ক্ষেতে-ক্ষেতে তিনটাঙার প্রজারা কলাই তুলছে। একটা বাবলা বন পেরিয়ে একটা সুন্দর পথে এলাম। বামদিকে পথের ছায়াঝোপ, কি সব ফুলে ফুটেআছে, বেশ ছায়া পড়েছে—সেইদিকটা কিছুক্ষণ ধীরে-ধীরেঘোড়া করে এলাম, পরেই আবার একটা উলুখড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিয়ে সামনে দেখিকতরুটোলা। তারপরেই পরিচিত সহদেব সিং-এর বাসার পাশ দিয়ে লছমন মণ্ডলের অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়েসোজা চলে এলাম কাছারি। পথেপথে উৎসব-বেশেসজ্জিতা নরনারী চন্দ্রগ্রহণের মেলা দেখে গল্প-গুজব করতেকরতে কোশকীপুর অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন বহু দূরথেকে অজানা পথ বেয়ে মোটরে কি এরোপ্লেনে করে নিজেপথ চিনেচিনে কখনো ধীরে কখনো জোরে ইঞ্জিন চালিয়ে চলেএলাম—পথে পাহাড় নদী, অজানা বনজঙ্গল, বেশ লাগলআজকার দিনটায় !

সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায়ঠেস্দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরিহয়েছে—ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুরবাড়ির দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়েনামলাম—সেই ঢোকেঢোকে জল খেয়ে তৃপ্তহলাম—পরদিন থেকে যাত্রা শুরু হল। মহারানী স্বর্ণময়ীরোড, ৪৫ মির্জাপুর স্ট্রিট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ি, গোয়ালন্দর স্টিমারে মাদারিপুর, বরিশালে অনাদিবাবুর বাড়ি, চাটগাঁয়ের স্টিমার, কক্সবাজারের স্টিমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে, জ্যোতির্ময়ের ওখানে ঢাকায়—আবার৪৫ মির্জাপুর স্ট্রিটে। বড় বাসায়, ইসমাইলপুরে,—কত জায়গায়। এই তো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলোয় শালবনের মধ্যে নির্জন রাত্রি যাপন করে গেলাম দেওঘর। তারপর এই গেলাম রামচন্দ্রপুরে, বেণুবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক্ গেটে সূর্যাস্তের সময়কত বেড়ালাম। এই তো গেলাম পাটনা—শোনপুরে মেলাদেখলাম। জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্যালেজাঘাটে স্টিমারে বসে চাখেতেখেতে গঙ্গা পার হয়ে পাটনায় বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানেফিরে এলাম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়িটা উঠছেতারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর সেই কালীর সঙ্গে নালন্দা, সেই রাজগীর যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোনভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনৌৎ, শো—অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলায় জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সাড়ে আটটার গাড়িতে রাজপুর ফেরা—সেইজাঙ্গিপাড়াকে ভাবতাম কতদূরের দেশটা ! কতদিন পরেআজ মনে হল সেই তারামোহনের পুরানো বাড়িটার কাছদিয়ে পথ বেয়ে কাদের বাড়ি গিয়েছিলাম—সেই কলকাতায়হাওড়ার পুলের কাছে অন্ধ ভিখারিণীকে রাত্রিতে জিজ্ঞাসাকরা—

এই অনবরত ভ্রাম্যমাণ জীবন। ঘুরতে হবেই যে—পথেযে নেমেছি—এই যে এখন তহশীলদার খবর দিলে রংবারলোক লালকিষণ সিংকে মেরেছে—এদেশের এই এখনখুনকার—আমাদের গ্রামের হয়তো এই রকম খুনকার আছে—হাড়িডাঙ্গায় কি বর্ধনবেড়েতে ডাকাতি হয়েছে—যাইহোক আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই,

অথচসবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব গতির রূপ আমারচোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েছিসত্যবাবুর বাড়িতে যেদিন থেকে সেই—অনেককাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ি মাণিকের গান হল—পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যেবোর্ডিং-এ এলাম—কি ক্ষণে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলামজানি না—সেই বিদেশবাস শুরু হল। পরে আরবারাকপুরকে বারোমাসের জন্য একবারও পায়নি—হারিয়েহারিয়ে পেয়ে আসছি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়েএসেছি ছেলেবেলায়—এখনো অন্য ভাবে পাই।

এখনো তো শৈশবের স্বপ্ন দেখা সে সব দেশ দেখতেবাকি আছে, পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন সত্যিই কি সে সব বাদ থেকে যাবে ?

॥ ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৭ ॥

আজ ও কালকের ঘোড়া চড়াটা ভালো লাগল। আজএকটু বেলা গেলেই বেরুলাম। লালকিষণ সিং-এর বাসারপথটা দিয়ে, কালোয়ার চকহাটের পথ দিয়ে যখন যাচ্ছিতখন সূর্য ডুবুডুবু। যেতে হবে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপার।খুব জোরে সুখটিয়া কুলবনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েদিলাম। ঘোড়ার এই চলাটা আজকাল বড় আরামেরমনেহয়। সহদেব সিং-এর টোলার কাছাকাছি সেই বনঝোপভরাপথটায় অন্যদিন থামি, কিন্তু আজ বেলা যাওয়াতে আর নাথেমে সোজা বেরিয়ে গেলাম। কতরুটোলার মধ্যে মেয়েরাইঁদারার জল নিতে আসছে, সেই জন্যে আস্তেআস্তেচালিয়ে বাইরের মাঠটায় পড়ে আবার জোরে ছুটলাম।ঝল্লুটোলার সামনে দিয়ে কলাইক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে এসেএকটা উঁচু আল পার হলাম—সে জায়গাটি বড় নির্জন, একটাছোট অশ্বত্থ গাছ, বনঝোপ, সন্ধ্যার ঘন ছায়া ও নির্জনতাবড় ভালো লাগল। পরেই এসে গঙ্গার ধারে প্রায়ান্ধকারপাহাড়টার দিকে চোখ রেখে দূরে দিক্‌চক্রবালের ধূসর সান্ধ্যমায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ার ওপর বসে রইলাম। সেই দিনটারকথা মনে পড়ে—সেই জেঠামশায়ের সঙ্গে কুঠির মাঠে গিয়েফিরে এসে ভেবেছিলাম কত দূর না গেছি। সেই দিনটিথেকে আজ কত দূর কোথায় চলে এসেছি ! মায়ের কথা মনে হল—ঠিক এই সময় মা বলতেন, আমায় শিগগিরযেতে হবে, ছেলের আবার বিয়ে দেব।

কি অপূর্ব এই জীবন। এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের, ভালোবাসার স্মৃতি জড়ানো—এইঅপূর্ব গতিশীল সুখ-দুঃখে মধুর এই সুন্দর জীবনদোলা !ধূসর পাহাড়টার ওপরকার সন্ধ্যায় অন্ধকার-ঘেরা বনরাজিরমাথার দিকে চেয়ে এর অপূর্বতা অনুভব করে গা যেনশিউরে উঠল—চোখে জল এল। তারপর কতক্ষণ আপন মনে ঘোড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা যখন বেশ হয়েগিয়েছে তখন আবার ঝন্নুদালু টোলা দিয়েই অন্ধকার মাঠেরবনঝোপের পথ বেয়ে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এসেলছমন মণ্ডলের টোলায় পৌঁছানো গেল।

তাই এইমাত্র অন্ধকারে কাছারির পথটায় বেড়াতেবেড়াতে মনেমনে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অন্যস্বর্গ চাই না—তোমার দৈবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে রেখে দিয়ো। যুগে যুগে তুমিএই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এসো, এই ফুল ফল, এই শোক দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতেরমধ্যে দিয়ে বার বার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়। এই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার বোঝাইবইতে পারি না—এর চেয়ে আর কোন্ বড় দান চাইবারসাহস করব ?বড় ভালোবাসি এই মাটির জীবনকে—এরইমাধুর্য যে লোভী বালকের মতো বার বার আস্বাদ করে সাধ মিটাতে পারি না, একে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি কিকরে ?

॥ ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৭॥

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হু-হু করে অগ্রসর হচ্ছে—এই সেদিন ১৯২৩ সালের এসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম—দেখতেদেখতে সে আজ পাঁচ বছর।

কাল সকালে ইসমাইলপুর থেকে খুব ভোরে বেরিয়েহাতির ওপর করে নবীনবাবু ও অমরবাবুর বাড়ি হয়েভাগলপুর গেলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে অমরবাবুকে রওনা করেএসেই উদয়বাবু ও বেচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুরেনের ওখানেগান শুনতে গেলাম। বড় ভালো লাগে সুরেনবাবুর গানআমার কাছে—এমন শুদ্ধ প্রাচীন সুর আমি কোথাও শুনিনি—যেসব পর্দায় সাধারণের কণ্ঠ নামে না, তাদের ওপরসুরেনবাবুর অপূর্ব দখল—সুর-লক্ষীর সকল রকম মানঅভিমানের খোঁজ তিনি রাখেন।

আজ সকালে উদয়বাবু স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে গেল।সত্যবাবুর ছেলে ভাদুর সঙ্গে একসঙ্গে এলাম—ভারি সুন্দরদেখতে, বাবার মতো একটু বাজে বকে, একটু হামবড়া ভাব। ক'দিন বড় হই-চই গেছে—আমি ওসব ভালোবাসি না।জগতের পেছনের যে নির্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, স্নিগ্ধ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরাদেয়—গভীর রাতের জ্যোৎস্নায় আসে। এটর্নি অফিসেরব্রিফসঙ্কুল কলকোলাহল কর্মমুখর জীবন আমার বিষেরমতো ঠেকে। তাই আজ শান্ত বৈকালে যখন কলবলিয়ানদীতে নৌকা পার হচ্ছিলাম, তখন বড় ভালো লাগল। এইআকাশ, এই বৈকাল, এই শ্যামল শান্তি, এই অপূর্ব উদারজগৎ—সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না—আমার জীবনে এরাই অক্ষয় হয়েথাকুক। চাই না তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক, মিনার্ভামোটরগাড়ি, পেলিটির বাড়ির খানা, অমুক এটর্নির এতআয়ের বিষয়সম্পত্তি। তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজঅ্যাক্ট, কোবালা, ওয়ার বন্ড তোমাদের থাকুক—এই নিঃসীম নীল শূন্য, ওই তারকারাজি, শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশরফুলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আমার আপনার হয়ে থাকুক।

বেশ মনে আছে, বহুকাল আগের শৈশবে, সেই শিউলিফুলেরতলায় ওদিককার ঘাসবনে যখন চড়াই পাখি, দোয়েল পাখিবসত, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতের পিঠে খেতে যে অপূর্ব কল্পনাজগতের স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতিধূলিকণায় তার লিখন আছে—কোন্এটর্নি অফিসেরমর্টগেজ দলিল দস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে ?সেই "নন্দসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্তন, সেই বকুলতলা, নট্কান গাছ, বিল্বিলে, পুবমুখো যাওয়া, ভরত—সেই অদ্ভুত শৈশবস্বপ্ন—আমার সে-সবই চিরদিনেরসম্পদ হয়ে থাকুক।

আর সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্সন শেলি চেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ওই ছেঁড়া কালিদাসখানা, রামায়ণ, বার্নার্ডশ'—এঁদেরই আমিচাই, এঁরাই আমার ঐশ্বর্য।

আজ আবার শান্ত গ্রাম্যজীবনের মধ্যে এসে পড়েছি।আবার প্রশান্ত জীবন, সুন্দর নাক্ষত্রিক শূন্য, সন্ধ্যার বিচিত্র কর্ণকদম্ব, বলোয়া এসে গল্প করছে, বলছে—ম্যানেজার বাবু, তুমি যখন আসছিলে তখন আমি কুলোকুমারের কলাইক্ষেতেবসেছিলাম, তার পর ভাই কড়ুরিয়া এসেছে, আনন্দিয়াএসেছে—এই সব গল্প করেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটা যেমন শান্তিতে কাটল—সারাবছরটা এই রকম কাটুক।

॥১লা জানুয়ারি ১৯২৮॥

আবার সে শান্ত জীবন আরম্ভ হয়েছে। কাল ও আজআবার আজমাবাদের কুলবন দিয়ে পাকা কুল খেতে খেতেঘোড়া ছুটিয়ে, সহদেব টোলার সেই তেলাকুচো ঝোপবনের ভেতর দিয়ে অস্তসূর্যের আলোয় ধীরেধীরে কুতরুটোলাদিয়ে গঙ্গার ধারের দূরের পাহাড়গুলোর ধূসর দৃশ্য দেখতেদেখতে গঙ্গার ধারে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানটাতে ঘোড়া দাঁড়করালাম। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নদীজল, পাহাড়, বহুদূরেরদিক্চক্রবাল কোনো মায়াজগতের ইন্দ্রজালময় স্বপ্নছবিরমতো অপরূপ দেখাচ্ছে। আবার সেই মাথার উপরেপ্রায়ান্ধকার আকাশের প্রথম নক্ষত্রটি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের জগতের অজানা কুহক নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—শৈশবের বাঁশবনের গভীর রাতে লক্ষী-পেঁচারডাকের মতো গভীর রহস্যভরা জীবনকে আবার ফিরেপেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাব্লা গাছের পাশের সরু খালেরপথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ক্ষেতে ক্ষেতে লোক গানগাচ্ছে, কলাই-এর বোঝা মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছে—ভীমদাসটোলার ঘরের উঠানে কলাই-এর ভূষায় আগুন করে গোল হয়ে লোকে বসে আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে, ঝল্লুটোলার ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে—দেখতে দেখতেবাইরের মাঠে পড়ি, একটু একটু জ্যোৎস্না ওঠে, হু-হু পশ্চিমে বাতাসে কন্কনে শীত করে, বাঁধটার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ডানদিকের অস্পষ্ট দিক্চক্রবালের দিকে চেয়েচেয়ে দেশের কথা ভাবি –ঠাকুরমা, পিসিমা, বড় চারা আমগাছতলায়, নদীর ঘাটে কি করে আনন্দ ভোগকরে গিয়েছেন গত পুরুষে, সে কথা ভাবি—জ্যোৎস্নায়পথের পাশের আকন্দগাছ চক চক করে, ধুতুরার ফুল সুন্দর দেখায়—কাছারি এসে পৌঁছাই।

॥ ৩রা জানুয়ারি ১৯২৮ ॥

একটু বেশি বেলা থাকতে আজ বেরিয়ে সুটিয়ার কুলবনে এগাছে ওগাছে কুল খেতে খেতে বন ঝোপ, অস্তমান সূর্য, আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ, ঘুঘু-মিথুন, সবুজগমক্ষেত দেখতে দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম।চতুর্দশীর চাঁদের আলো গঙ্গার জলে অল্পঅল্প পড়ে চিক্ চিক্ করছে—ওপারের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি দেখে হঠাৎ মনে হল—আমি সুনীল ভূমধ্যসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দূরেরকোনো দ্বীপের দিকে চেয়ে আছি—হাজার দু'হাজারবছরকার আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন

চোখেপড়ে—কত সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীর দল—থ্রেসদেশীয়সামান্য গৃহস্থঘরের শান্ত সহজ জীবনযাত্রা, কত এলাম, ওক্, মাটল গাছের ছায়া, বন্য আঙুরলতার ঝোপঝাপ, জুনিপার গাছের বন—হাজার বছর আগের যে লোকদল, তাদেরসভ্যতা-গর্ব, সোনারুপার রথ নিয়ে ওই অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্নদূর তীরভূমির মতোই ছায়া হয়ে হাজার বছর আগে কোথায়মিলিয়ে গিয়েছে। অনন্ত জীবন কেবল এই নীলজলধিরাশির মতো অনন্ত পানে বেয়ে চলেছেএকটানা—বড় বড় সাম্রাজ্যের কঙ্কাল, তীরস্থ শেওলা, জলজউদ্ভিদের মতো একপাশে হেলায় ফেলে রেখে দিয়ে উদাসীরমতো চলেছে। আবার এখন থেকে হাজার বছর কেটেযাবে...সে দূর ভবিষ্যতের নবোদিত প্রভাত সে যুগের তরুণবংশধরদের কাছে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, মোটর এরোপ্লেন, বেতারযন্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিতান্ত আদিম যুগের পণ্য বলে বিঘোষিত হবে। প্রাচীন রোমানদের স্বর্ণরৌপ্য জাঁকজমকওয়ালা স্প্রিংবিহীন গাড়ির মতো।

মানুষকে শুধু চলতে হবে। চলাই তার ধর্মপথের নেশাতোমাকে আশ্রয় করুক। যুগেযুগে তোমাকে আসতে যেতেহবে—নবনব প্রভাতে নবনব ফুলফল, হাসিমুখ তরুণ, শৈশব স্নেহ প্রেম আশা হাসি জ্যোৎস্না—পথের বাঁকে বাঁকেডালি সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—অনন্তজীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনেফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুসুদ্ভূ স্বয়ম্—এই চলার বেগেরঅমৃত তোমার আপনার জীবনে সত্য হোক।

জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে, নতুবা আত্মার দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরাদেবে। হে জীবন পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে প'ড়োনা।

॥ ৬ই জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ পূর্ণিমার দিক্‌টা পূর্ণচন্দ্রকে ভালো করে উপভোগ করবার জন্যই একটু দেরি করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া কুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচো ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্যের রাঙা রোদ ঝোপঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়েআসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচো লতা, নাটাকাঁটারঝোঁপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতেকরতে মুখে দোদুল্যমান আলোকলতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্যের রক্তগোলকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়েদেখতে দেখতে কুতরুটোলায় এসে পৌঁছলাম। তারপরপাখির কাকলি শুনতে শুনতে ডাইনের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দূরেই সন্ধ্যার কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গা ওপারের পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণচন্দ্র ততক্ষণ উঠেগিয়েছে—গঙ্গা জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দিয়াড়া থেকেমাথায় করে লোকে কলাই-এর বোঝা নিয়ে ফিরছে—মাঠেখুপড়ি থেকে কলাই-এর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে—তারই ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কি অপূর্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেইকতদিন আগে—মনে পড়ল এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গেগিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়িতে। সেই ছোট্ট ঘরটাতেথাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্রপাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদেবসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবলপড়া স্বপ্নের মতো মনে আসে। এই আজকাল পূর্ণিমায় সেইআড়ংঘাটার ছাদটা কি রকম দেখাচ্ছে ?বাবার করুণস্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলব ?ওপারেরধূসর পাহাড়শ্রেণী, কুয়াশাচ্ছন্ন উদাস গঙ্গাবক্ষ, সুদূর পূর্ব দিক্‌চক্রবাল...এদের সামনে রেখে কেবলই মনে পড়েআমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুরঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছামতীরধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ি, পুরোনো স্মৃতির সবজায়গাগুলোতে। কুঠির মাঠের কথা হঠাৎ মনেপড়ে—দেশের জন্যে মন কেমন করে ! তারপর পূর্ণচন্দ্রকে পেছনে রেখে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। চারধারের মাঠ কুয়াশায়ঘিরে রয়েছে, সারাদিনে পশ্চিমে বাতাসের পরে এত ঠাণ্ডাপড়েছে যে হাতে দস্তানা পরেও আঙুল কনকন করছে—ভীমদাসটোলায় ঘরেঘরে লোকে কলাই-ভূষার 'ঘুর' লাগিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে—ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে। গত বর্ষাকালে যে খালটা দিয়ে নৌকা বেয়ে ভণ্ডসিং-এর বাড়ির পিছনের ঘাট দিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সেখালটার জল এখন শুকিয়ে গিয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এলাম। বাঁধের ওপরে উঠে আবার আড়ংঘাটার কথা মনে এল। বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এরটোলার অশ্বত্থ গাছটার কাছ পর্যন্ত। এত জোরে এলাম যেপরমেশ্বরী কুমারের যে খুপরিতে লোকজন আগুন তাপছিল—তারা হাঁ করে চেয়ে রইল।

॥৭ই জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ নতুন পথে গেলাম। সীমানায় চলে গিয়ে অযোধ্যা সিং-এর বাড়ির কাছের পথ ধরে মহারাজির জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আজকার মতো একদৌড়ে অতটা পথ কোনো দিন ঘোড়া যায়নি। ফাঁকা মাঠ, দুপাশে ঘন কাশের ও নলখাগড়ার বন পার হয়ে বড় বাবলা বনটার পাশ দিয়ে সোজা উত্তর-পূর্ব কোণে ঘোড়া ছাড়লাম।বটেশপুর দিয়াড়া দিয়ে রাস্তা। মাঠ জঙ্গলের ধার দিয়ে গিয়েসোজা পৌঁছানো গেল কলবলিয়ার কিনারায়। কাটারিয়ার এপারে কলবলিয়া যেখানে গিয়ে কুশীর সঙ্গে মিশেছে তারএকটুএদিকে জল কম। বটেশপুর দিয়াড়া থেকে কলাই-এরবোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা হেঁটে নদী পার হচ্ছে—সেইপথে ঘোড়া সুদ্ধ পার হয়ে গিয়ে কাটারিয়ার সামনে নতুন রেলপথের ধারে এক বাবলাবনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বেশসুন্দর ছায়া, পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু নীচু ভূমি—দুটি মেয়েতে কাঠ ভাঙছিল। তারা বললে, এ রাস্তা নয় পুলে যাবার—সামনে দিয়ে পথ। সেখান থেকে নেমে নতুন বাঁধেরনীচে যেতে হবে। কাটিহারের ট্রেনখানা বেরিয়ে গেল।একটা জলাতে দুটো বড় বড় জাঙ্গিঘল পাখি বসেছিল।বটেশপুর দিয়াড়াতে এক ঝাঁক ঘুঘুপথের পাশ দিয়ে উড়েগেল—বন্দুকটার জন্যে হাত নিসপিস করে।

তারপর খাড়া উঁচুপথে বাঁধটার ওপর ঘোড়া ছুটিয়েপুলটার কাছে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বাবলা বন ও তেলাকুচা ও অন্য অন্য লতাপাতার ঝোপ—সন্ধ্যার ছায়ায় শ্যামল শীতল। কাটারিয়ার স্টেশনের ওপারে লাল টকটকে সূর্যটা অস্ত গেল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ফিরিয়েআবার ঢালু দিয়ে তেলাকুচো-ঘেরা বাবলা-বনটার মধ্যে নামলাম। জেলে দুটো যেখানে রেলবাঁধের নীচে খুপড়িবেঁধে আছে, সেখান দিয়ে নেমে এলাম। তারপরবাবলাবনের পাশ দিয়ে এসে কলবলিয়া পার হয়ে জোরেঘোড়া ছাড়লাম। খুব বেলা গেলে আজ বেরিয়েছিলাম কিন্তুএতটা পথ গিয়ে আবার ফিরে এসে ভালো করে অন্ধকার হবার আগেই আজমাবাদ সীমানা ছাড়িয়ে জনকধারীসিং-এর বাসার কাছে এসে পৌঁছে গেলাম।

॥ ৮ই জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ দুপুরের পর বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম।অন্য অন্য বার যে পথ দিয়ে যাই আজ সেই পথ দিয়েযাইনি। গুহাটার সামনে দিয়ে একটা পথ গভীর বনের দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে গেলাম। কত কি বনের গাছ—একটাপাথরের ওপর বসে বসে দূর পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবনেরশোভা দেখলাম। পাহাড়ের ওপর অনেক কাঞ্চনফুল গাছেফুটে আছে। সেখান থেকে তলা দিয়ে গিয়ে গিয়ে গভীরএকটা বনের কাছে পৌঁছলাম। কল্পনা করছিলাম—চাবুকটাযেন আমার ধনুক—বটগাছের যে ডালটা ভেঙে নিয়েছিলামসেটা যেন আমার বাণ। সভ্য জগৎ থেকে দূরে এক বন্যআদিম মানুষের জীবনযাপন করতে আমার বড় ভালো লাগে। তাই গাছ যেখানে বড় ঘন, ঝোপ খুব নিবিড়—তারইনীচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করতে করতেযাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের ওপর বন্যবেতের গাছ হয়েছে—এর আগে বটেশ্বর পাহাড়ের বন্য বেতের গাছ কখনো দেখিনি। অনেকক্ষণ পাথরটার ওপর বসে বসে ভাবছিলাম—শৈশবে শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা, ভীষ্ম, সাত্যকি, অশ্বত্থামা এই সব পৌরাণিক চরিত্রও আমারকাছে জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশেপাশে বনে বাদাড়েতাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে ! রোদ রাঙা হয়ে এলে পাহাড় থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম। একটাস্টিমার সকালথেকে চড়ায় আটকে আছে। একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পার হচ্ছিল, তার বাপের সঙ্গে নতুনশ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। ঘোমটা খুলে কৌতূহলী চোখে স্টিমারটাদেখতে লাগল। নিজে হাল ধরে নৌকা ঠিক ঘাটে লাগিয়েদিলাম। রাম সাধোকে বললাম, তুমি ঝল্লুটোলা হয়ে চলেযাও। তারপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্থানটিতেএসে দাঁড়ালাম। কত কথা মনে হয়—সেই আড়ংঘাটায়বাবার সঙ্গে যাওয়া, সেই চাঁপাপুকুর, কত কি ?জীবনটা কি বিচিত্র তাই শুধু ভাবি। সত্যবাবুদের বাড়ি থেকেও এরবিচিত্রতা যেমন দেখলাম—বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে এইবিদেশে পাহাড় নদী বন গঙ্গা অস্তগামী রক্তসূর্যে বিচিত্রতারমধ্যেও তেমনি দেখছি।

খুব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ-ভরা তারার নীচে দিয়েঅন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ভীমদাসটোলা দিয়ে বাঁধেরউপর দিয়ে কাছারি ফিরলাম। পথ দেখতে পাই না—ঘোড়াশুধু আপনার ঝোঁকে কদমে চলে। শুধু আমি আর নির্জন মাঠ, একরাশ অন্ধকার, নতুন জিনটার মস মস শব্দ ও মাথারওপরে জ্বলজ্বলে বৃহস্পতি, দীর্ঘ ছায়াপথ।

কাল সকালে এখান থেকে ভাগলপুর যাব।

॥ ৯ই জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ কাঞ্চনগড়ে গাড়ি করে গিয়ে বিভাসবাবুর সঙ্গেসব কথাবার্তা কইলাম। তারপর ফিরে এসে ক্লাবে চণ্ডীবাবুও অমূল্যবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যচর্চা করা গেল।কাল সকালে এক বোতল জ্যাম কিনে নিয়ে ইসমাইলপুরযাব।

ক্লাবে মডার্ন রিভিউ পড়ছিলাম। সিসিলিয়া মরলেরলেখা বড় ভালো লাগল। প্রাচীন দর্শন, উপনিষদের এইতত্ত্ব বিদেশিনীর এত ভালো লেগেছে—বড় আনন্দ হল।জীবনে জ্ঞানপিপাসু, উন্নতিপিপাসু, আধ্যাত্মিক পবিত্রতারজন্যে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত আত্মা খুব কম। দু-একজনের সঙ্গেপরিচয় হলে বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

এই কৌতূহল, এই ব্যগ্রতা, একটা কিছু হব, আরো উন্নতিকরবো...এইটাই আঁকবার। টমাস হেনরি রাদারফোর্ডেরমতো শত শত সুন্দর তরুণ যুবক প্রাচীনদিনের রাইনেরপ্রাসাদে প্রাসাদে—তাদের জীবন, দুঃখ, অদৃষ্ট মনে বড়লাগে। যে মেয়েটি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তার কথাজেনে মনে একটা বড় উৎসাহ হয়। এই জ্ঞান-সুধা যেজাতির মধ্যে আছে তারা যদি বড় না হয় তবে বড় হবেকে ?

শৈশবের সে স্বপ্নের দিন আর নেই। উত্তর জীবনে এইআধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন, এই জীবনকে realise করবার মতো ক্ষুধা—এইটাই আঁকবার।

॥১২ জানুয়ারি ১৯২৮, ভাগলপুর॥

পৌষ সংক্রান্তি। সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনাকরা গেল। তারপরে বেলা হলে আমরা চার পাঁচ জনেগঙ্গাস্নান করতে গেলাম। রোদ বড় প্রখর লাগতে লাগল।ছোট জলাটা পার হয়ে আমি ও নায়েববাবু ওপারের চড়ার পারে বড় গঙ্গায় নাইতে গেলাম। আমি আসবার সময় গল্প করছিলাম, সেদিন বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েনেমে আসবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণায় সেই বৈকালের ছায়াভরা পাথরের ঘাটটিতে পাণ্ডাঠাকুরের গেলাসে করেসেই নির্মল শীতল গঙ্গার জল যে খেয়েছিলাম—তার কথা।ফিরে এসে নতুন ঘরের নিকানোপোছানো দাওয়ায় চেয়ারপেতে বসে ভাবছিলাম, বাংলাদেশে বসন্তদিনআসছে—সেই প্রথম গা-নাচানো মন-মাতানো দখিনহাওয়া, সেই পাতা-সাজানো বৈঁচিগাছ, বাতাবিলেবু ফুলেরগন্ধ, কোকিলের ডাক, সেই দিনগুলো। জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা। উদারভাবে প্রসারিত মনেভোগ বা বেঁচে থাকবার আর্ট। এটুকুও শিখতে হয়।

॥১৪ই জানুয়ারি ১৯২৮, ইসমাইলপুর॥

বৈকালে ঘোড়া করে বেড়াতে বেরুলাম। লোধাইটোলারওদিকে জলার ধারে রাইচীক্ষেতের দিকে আকাশটা কি সুন্দরদেখাচ্ছিল—এত রাঁইচীফুল ফুটে আছে—দূরে সন্ধ্যার ধূসরআকাশের নীচে উন্মুক্ত দূরপ্রসারী হলুদ রং-এর রাঁইচীক্ষেত কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল। এই শুকনো কাশবনের সোঁদা সোঁদাছায়াভরা গন্ধ, এই উদার নীল আকাশ, এই ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্র, এই নির্মল বাতাস, চখাচখির সারি, দূরের ধূসরপাহাড়রাজি, এই গতির বেগ—সব সুদ্ধ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি নাভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল যাত্রাপথের পথিক যারা নয় জীবনসম্পদে তারা দীন।

বসিরহাট থেকে পত্র এসেছে বহুদিন পরে পাটালি পাঠানোরজন্যে। বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০, মির্জাপুরের কলেজহোস্টেলে এই শীতের দিনের যে অপূর্ব দিনগুলো—সেইপ্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, মায়াজগতের স্বপ্ন, শিশিরবাবুরঅভিনয় 'ইন্‌স্টিটিউট'-এ দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথেতাই নিয়ে যে মেতে থাকা ! তারও আগে এই প্রথম বসন্তেরদিনে রমাপ্রসন্নের জন্যে ফাল্গুনী দেখতে যাওয়া—সেই 'ফাগুনলেগেছে বনে বনে'—সেই ভূতনাথের সঙ্গে দেখা করতেগিয়ে তার সঙ্গে Landor পড়ার দিনগুলো ! সেই গ্রামেরবসন্ত দেখেছি১৯১৭ সালে, এই দশ বৎসরের মধ্যে তাআর হয়নি।

॥ ১৬ই জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলে কি স্টিমার ধরতে পারতাম ?জঙ্গল থেকে বার হয়েই দেখি স্টিমারএপারে। ভাগ্যিস ছিল ছোট ঘোড়াটা—বালির চর বেয়েঝড়ের বেগে ঘোড়া উড়িয়ে তবে এসে স্টীমার ছাড়বারঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলাম ঘাটে।

দেবীবাবুর ধর্মশালায় উঠেছি আজ। একবার সরাইখানারঅভিজ্ঞতাটা হোক না ?দুনিয়াটা তো একটা বৃহৎ ধর্মশালা—বড়র মধ্যে যে জিনিসটা ছোটো অথচ বড়রই প্রতীক সেটাকে চিনেনিই।

পাশের ঘরে কে একজন গান গাচ্ছে আর বেহালাবাজাচ্ছে—বাঙালি মনে হচ্ছে। 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গান ধরেছে।

একটা জিনিস নতুন ঠেকছে। কয়দিন হাতে অনেক কাজ, দেখি কি করি।

আজ ছিল বৃহস্পতিবার—আমাদের দেশের হাটবার। স্টিমারের ডেকে বসে বসে কেবল মনে ভেবেছি আমাদেরবাঁশবনে ঘেরা ভিটাটিতে দূর শৈশবের একদিনে সামনেরপুরানো পাঁচিলটা দেখতে দেখতে হাটে বেরুচ্ছি। খানসামা চা দিয়ে গেল, চুমুক দিতে দিতে বার বার সেই কথাই মনে আসতে লাগল। উপরের ডেক আজ ছিল বড় নির্জন, বসেভাববার বড় সুবিধা।

মানসিক ঘুম বলে একটা জিনিস আছে...শারীরিক ঘুমেরচেয়েও তাতে মানুষকে লক্ষ্মীছাড়া করে ফেলে ! দেহে সজাগথাকা কঠিন না হতে পারে কিন্তু মনে সজাগ থাকা কঠোরসাধনার ওপর নির্ভর করে। সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি।

॥ ১৮ই জানুয়ারি ১৯২৮, ভাগলপুর॥

এই দিনটাতে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম সাজকীর টিলায়।দুপুরের পর আজ হেঁটে সাজকী চলে গেলাম। উঁচু টিলাটারওপর তেঁতুলগাছটার তলায় চুপ করে অনেকক্ষণ নির্জনেবসে বসে চারিদিকের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব শান্তিরমধ্যে শ্যামল তালশীর্ষগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কতবছর আগেকার সেই শৈশব সুরটা যেন বাজে—একপুরানো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর। কত দিগন্তব্যাপীমাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, কত মধ্যাহ্নআবার যেন ফিরে আসে পঁচিশ বছর পরে।

এই শান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই মনে পড়ে জীবনটাকি—তা ভেবে দেখতে হবে। এই পঞ্চাশ ষাট বছরের এবারকার মতো জীবনে কি সারাজীবন ফুরিয়ে গেল ?এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও খোলার আহ্বান, তেলাকুচালতার দুলুনি—এ সব যে বড় ভালো লাগে।

কে জানে হয়তো যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছরপরে। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়া আরো একটা অপার্থিবজীবনধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্যআরো ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্যের সত্যের উপভোগেইজীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

তা যদি হয় তাতে সময় নেবে। হাজার বছর না হয়পাঁচশো বছরও হতে পারে। এসব বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নেই। চিন্তার গোঁড়ামি আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতিস্থাপকমন না হলে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত। কাজেই যদি ধরেনেওয়া যায় ওপরের কথাটাই সত্য তো এই পৃথিবীর আলোহাওয়া জল মাটির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে ?তাই নীরব রহস্যভরা মধ্যাহ্নে সেই বিদায়-বেদনার সুর বড়বাজে।

অমরবাবু, উপেনবাবুর সঙ্গে রণজিৎবাবুর বাড়ি যাওয়াগেল। ফিরে আসতে আসতে কথা হল, আমরা বেদের দল, তাঁবু ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছি। রাখালবাবু চলেনকলেজে—উপেনবাবু তল্পি নিয়েই মঙ্গলবারে কলকাতা।ভাগলপুর শূন্য হয়ে পড়েছে। কাল আবার সঙ্গীতসমাজে Recitation-এ বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হবে।

॥ ২১শে জানুয়ারি ১৯২৮॥

সঙ্গীতসমাজে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারকগিরি করতে গেলাম বেলা তিনটার সময়। সেখানে একটা ছেলেসুন্দর আবৃত্তি করল। সেখান থেকে চণ্ডীবাবু অম্বিকাবাবু ওআমি গেলাম ক্লাবে। সেখান থেকে চা-এর নিমন্ত্রণেগেলাম। সারাদিন Engagement-এর ভিতর দিয়ে দিনটিবেশ গেল।

একদিকে যেমন সরল সহজ জীবন দরকার অন্যদিক থেকে আলো শিল্প সৌন্দর্য সঙ্গীতও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না। !

॥২২শে জানুয়ারি ১৯২৮॥

কাল যেমন সারাদিনটি বাদলা গিয়েছে ঘোরাও গিয়েছে সারাদিন খুব। বেলা চারটার সময় বেরিয়ে ভিজতে ভিজতেউপেনবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে স্টেশনে উপেনবাবুর টিকিটবিক্রি করতে। সেখান থেকে ধর্মশালায় খেয়েই বেরুনোহল চণ্ডীবাবুর বাড়ি। সেখান থেকে অমরবাবুর বাড়ি হয়েউপেনবাবুর বাড়ি গিয়ে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠেচা খেয়ে সেখান থেকে এলাম সুরেনবাবুর বাড়ি। তারপরধর্মশালায় বসেই ইসমাইলপুর রওনা হওয়া গেল। খুব মেঘ মাথায়, ঘোড়াটা জোরে ছুটিয়ে ভিজে কাশের গন্ধ উপভোগকরতে করতে এলাম কাছারিতে।

পরদিন বৈকালে বর্ষণসিক্ত সবুজ কচি গমের ক্ষেত ওহলুদ-রং ফুলে ভরা রাই ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দূরের পাহাড়গুলোয় আবার পরিষ্কার নীল রং ধরেছে—বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের তলেসবুজ গম ক্ষেত ও হলুদ রং-এর সমুদ্রের মতো ফুলে ভরা রাই ক্ষেত আমার চোখে কি মোহ-অঞ্জন যে পরিয়ে দিল !ঈশ্বর ঝা লোধাই টোলা থেকে বেরিয়ে দুঃখের কথা বলতে বলতে আমার ঘোড়ার পিছু পিছু কুণ্ডীর কাছাকাছি গেল।সেখান থেকে সে-পথে গঙ্গা দেখে ফিরলাম। বালা মণ্ডলেরটোলা আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটাযা ছুটল ! শুয়োর যেসব ক্ষেত খুঁড়েফেলেছে তার মধ্যদিয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটল।

॥ ২৪শে জানুয়ারি ১৯২৮॥

এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পূজার দিন এভাবে বাদল হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার করে টিপ টিপ বৃষ্টিপড়ছে। এখন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় বসে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকারকরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্তকালেরপ্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম ‘ফাগুনলেগেছে বনে বনে’। আজ অনেক লোক খাবে, বলে দেওয়াহয়েছিল—কিন্তু দই আসেনি বলে ঘোড়া নিয়ে মুকুন্দী চলেগেল বাসনাকুণ্ডু। বায়না করে সরস্বতী পুজোর আয়োজনহল ঠিক আর বছরের মতো। ঈশ্বর ঝা পুজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম। নায়েব মশায়ের বাসাথেকে পিঁড়ি আলপনা দিয়ে নিয়ে আসা হল। বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরিটা ও রামায়ণখানা বার করে দিলাম ঠাকুরের পিঁড়িতে। বাবার খাতাখানা নিজের হাতে চন্দন মাখিয়েফুল সাজিয়ে বড় আনন্দ পেতাম। তিনি কি জানতেন তাঁরমৃত্যুর পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তাঁর লেখা ছেঁড়াখোড়া খাতাখানা বিহারের এক নির্জন কাশবনের চরেরমধ্যে ফুলচন্দন দিয়ে অর্চিত হবে ?

ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম।ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায় না—হুকুম দিয়ে আনালাম,এদের দিলাম। রামচন্দ্র সিং আমিনকে লোক পাঠিয়েআনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম। তারপর গাঙ্গোতারাবাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়েতাদের খাওয়ালাম। প্যাঁড়া মহুয়া দই ও একটু একটু করেগুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে বসেখেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখেজল এল।

করুয়া চামার ছেলেপিলে নিয়ে অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টিরমধ্যে ভিজে ভিজে ময়লা গামছা পেতে চিঁড়ে খাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে—শুখা আছে মালিক, হে মালিক থোড়া গুড়।সিকলা পরিবেশন করছে, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিচ্ছেনা।ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে বসে আরামকরবার কোনো অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতেভিজতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ওতাদের ছেলেদের আরোদই গুড় আনিয়ে দিলাম।

অন্ধকার বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধু-ধু মাঠের দিকে চেয়েমনে পড়ল, কতকালের সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতীপুজোতে কুঠির নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া।

কতকাল—কতকাল আগে—

জীবন কি অদ্ভুত, তাই মনে মনে ভাবি—

সেদিন সাজকীর সেই অপূর্ব দুপুরটা মনে পড়ছে। সেইরৌদ্রদীপ্ত তালবৃক্ষশ্রেণী, সেই অপূর্ব শৈশব স্মৃতিটা—সার্থক ছিল সে যাত্রা আমার। শুভক্ষণে ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছিলাম।

বড়লোকের বাড়ির অভিজ্ঞতাটুকু লিখছি।

রামচন্দ্র সিং আমিনকে আমার বড় ভালো লাগে। একা জঙ্গলের ধারে থাকে। আমোদ উৎসবে ওকে কেউ ডাকেনা।বড় শুদ্ধ-সত্ত্ব লোক। তাই আজ ওকে ডেকেছি। প্রসাদপেয়ে স্ফূর্তিতে কাছারি ঘরে বসে গান করছে—

তেরা গতি লখি না পারিয়া—

হরিচন্দর রাজা...পিয়ে ডোম ঘরে শনি দয়া হোইজী..

আর বারের মতো। সেই আমার ভয়ানক Home sickness পশ্চিমে হাওয়া—হীরেনবাবু, কালীঘরে লিখবার টেবিল...ঘুর পোয়ানো...জঙ্গলের মাথায় চাঁদ ওঠা।

খুব হাসছে, আর গাইছে :

একলাখ পুত সওয়া লাখ নাতি—

সকরি কোই নাম আয়ী—

দয়া হোই জী...

'কোই নাম আয়ী' অংশটা বার বার জোর করে গাইছে।গোষ্ঠবাবুও মহা উৎসাহে কীর্তন করছে। রামচরিত ভিজতেভিজতে নওগাছিয়া ডাকঘর থেকে এসে বললে, চিঠিপত্তরকিছু নেই।

॥২৭শে জানুয়ারি ১৯২৮॥

আজ সবুজ গম রাঁইচীক্ষেতে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলাম।ফিরে এলে গোষ্ঠবাবু ঘরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। ছটুসিং-এর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে দেশের কুঠির মাঠের একটাদিনের ঘটনার ছবি অস্পষ্ট মনে এল। নতুন বোষ্টমীরআখড়ার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে একদিন সকালে কুঠিরমাঠের দিকে যাওয়া। আটির নীচের ক্ষেতে কে নতুনচষেছে—জ্যাঠামশায় না কে সঙ্গে আছেন—ফিরে এলাম।

সে কি প্রথম দিনটা কুঠী যাওয়া ?ভালো মনে হয় না।

সেই সময়ের মনের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ওইদিনটা স্পষ্ট মনে এলে ওই দিনের—পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে।দুটো এক ফটোগ্রাফের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিষ্কেরকোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্য প্লেটের তলে চাপাপড়েছিল—আজ হঠাৎ হাত পড়েছে।

॥ ২৮শে জানুয়ারি ১৯২৮॥

অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি ! এরকম রাত্রি দিয়াড়া ছাড়া অন্যকোথাও দেখা যায় না—আর দেখা যায় বড় বাসার ছাদে।চারধার নিস্তব্ধ, সামনের কাশবনের মাথায় দুগ্ধশুভ্রজ্যোৎস্নাধৌত আকাশে রহস্যময় তারার দল। শুধুই মনেপড়ে, জীবনটা কি বিচিত্র রহস্য—এ শুধু একটা বিচিত্র অনন্তরহস্য, এর সব দিকেই অসীমতা—যেদিকে যাওয়া যায়। চাঁপাপুকুরের সেই যে বাড়িটাতে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাদেরগ্রামের সেই দশ-বিঘা দানের বাঁশবন, বড় চারা আমতলায়, জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের সামনের মাঠে—এরকম জ্যোৎস্নাপড়েছে আজ—যখন এই সব বিভিন্ন স্থান তৎসংশ্লিষ্ট স্মৃতিরকথা মনে ভাবি তখনই হঠাৎ জীবনের বিচিত্রতা প্রগাঢ়রহস্য আলোকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমারচোখ গিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির উপর—কেজানে ওর চারপাশের অন্ধকার গ্রহদলের মধ্যে মধ্যে কিবিচিত্র জীবন-ধারা-প্রবাহ চলেছে। কোন্ দেববালকেরমায়াময় শৈশব স্বপ্ন দেশের গাছপালা ভূমিশ্রীর মধ্যে কাটছেযুগে যুগে—অপূর্ব দেবতার লীলাভূমি কত সৌন্দর্য ভরা নব নব জগৎ—কত উচ্চস্তরের জীবকুল।

হাজার হাজার বর্ষস্থায়ী বিচিত্র প্রেম তাদেরজন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন মৃত্যুবিরহমিলনের ভিতরে অক্ষুণ্ণ, চির সজীব ধারায় বয়েচলে—কত সভ্যতার উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে, কতপৃথিবীর ধ্বংসসৃষ্টির তালে তালে। প্রাচীন ইজিপ্টের সেরাজকন্যার আত্মার কথা মনে পড়ে। এক বত্রিশ বৎসরেরজীবনে যদি এই আনন্দের এই প্রাচুর্য, অনন্ত জীবন পথের পথিকদের হাজার হাজার বৎসর স্মৃতির মধ্যে কি অমৃতসঞ্চিত আছে—যদি অমৃতের পুত্রেরা তাদের সত্যকার অধিকার না হারিয়ে ফেলে ?জন্মে জন্মে যুগে যুগে হারানো প্রেম ফিরে পাওয়া স্বপ্ন কল্পনা, না বাস্তব ?

মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে ?সেখানে তোলেখা নাই—আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ নাই, তবে কোন্উদ্দেশ্যে মানুষের কর্মপ্রবাহ ?হয়তো সেখানে তার উত্তর মিলবে।

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্বজ্যোৎস্নারাত্রি এই নির্জন মুক্ত জীবন ভালোবাসি। প্রাণভরেভালোবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরেরজ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়েরইলাম—কালীধরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তারমাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশেররহস্যবার্তার মতো একটা বড় নক্ষত্র, নির্জন

ঝাউঝাড়েরমাথায় জ্বলজ্বল করছে—হু হু পশ্চিমে হাওয়া বইছে—কি এক অপূর্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে ! কি সব চিন্তা আনে ?কি মাধুর্য...মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে। আজ কাছারির সামনে কাশজঙ্গলে সূর্যাস্তের সময় বেড়াতে গেলাম। গভীর নির্জনতা শুকনোকাশের ভরপুর গন্ধ—বাঁকাডাল বড় ঝাউ-এর ঝোপ শুকনো খটখটে মাটির গন্ধ—সোঁদা সোঁদা—অনেকদূরে ভাগলপুরেগঙ্গার ওপর রাঙা সূর্যটা ঢলে পড়ছে।

এই অপূর্ব সূর্যাস্ত এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। এর সঙ্গেপরিচয় এদেশে এসে—বিহারের এই দিগন্তব্যাপী মাঠ, চরের মধ্যেই দিগন্তলক্ষ্মীরললাটরক্ত সিন্দূর-বিন্দুর মতোঅপূর্ব অস্তসূর্য সবুজের সমুদ্রের মতো শস্যক্ষেতের ওপর যখন ঢলে পড়ে তখনই মনে হয় অনন্ত অন্তরতম অন্তরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে—আমার উদ্দাম মুক্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মন এই প্রসারতা এই নির্জন বন্য সৌন্দর্যের কর্কশ প্রাচুর্যমুগ্ধ হল, সার্থক হল।

তাই আজ ভাবছিলাম জীবনে কেউ শত্রু নয়—অল্পদিনেরব্যবধানে যাকে মনে হয় অমিত্র, দূরের ব্যবধানে তাকে দেখাযায় সে জীবন পরম মিত্রের কাজ করছে। রাজকুমারবাবু, খুকি—এ দুজনের মতো মিত্র কে?

আমার প্রসারতাপ্রিয় নির্জনতাকামী মনকে ধ্যানেরঅবসর এরাই না যুগিয়েছে ?ভগবান এদের আত্মাকেআজকালের জ্যোৎস্নাধারার মতো শুভ্র করুন।

কাল সকালে উঠে জোয়ান ক্ষেত দেখতে দেখতেমুক্তিনাথের স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বাসনাপুর যাব।সকালে রামগিরিতে রামের ঘোড়াটা যাবে ঠিক হল আর রামধনিয়া চাকর ব্যাগ নিয়ে যাবে। ভাটলি গোটা দেখে আমি ঘোড়া নিয়ে ওই পথে অমনি চলে যাব জোয়ানক্ষেতে, সেখানে গণপৎ তহশীলদার ও মোহিনীবাবু আমিনউপস্থিতথাকবেন। পরে কাছারিতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেআহারাদির পর বৈকালে ফিরব।

বড় ভালো লাগে এই উন্মুক্ত জীবন, বড় ভালো লাগেএই দিয়াড়া, এই অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, এই বন, কাশ ঝোপ, দূরের নীল পাহাড় দুটি, এই ঘোড়ায় চড়া, এই সর্ষে ফুলেরগন্ধ, সকলের চেয়ে মনকে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার এই অপূর্ব অবকাশ !

বাঙালি মণ্ডল আজ এক ঝুড়ি কুল নিয়ে আজমাবাদথেকে এসেছে। ওদের বখ্‌শিশের কম্বল নিয়ে যাবে।

সকালে বার হয়ে ঘোড়া করে রাই ক্ষেত দেখে পরশুরামপুর চলে গেলাম। সেখানে বহুদিন পরে কলবলিয়ায় অবগাহন স্নান করা গেল। দূরে কহন গাঁয়ে নীল পাহাড়টাবড় ভালো লাগছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রামকরার পরেই গোষ্ঠবাবু ও আমি হেঁটে বার হলাম। সত্যি, হাঁটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ঘোড়ায় চড়েপাওয়া যায় না। নাড়া বইহারের কাছে দূরপ্রসারী ঘনশ্যামযব গমের ক্ষেত, আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সারি বড় ভালো লাগছিল—বহুকাল পরে অনেক দূর পায়ে হেঁটেযাওয়ার সুখ অনুভব করলাম। পথের পাশেই নীল ফুলেভরা খেঁসারির ক্ষেত, চন্দন রং-এর ফুলে ভরা মটর ক্ষেত, কোথাও আধশুকনো দূর্বা ঘাসের ক্ষেত ! গোষ্ঠবাবু আসতেআসতে আবার কল্লর চৌধুরীর ক্ষেতের কাছে এসে পথহারিয়ে ফেললে। আধশুকনো দূর্বা ঘাসের ঘন কাশবনেরমধ্যে দিয়ে সুঁড়ি বেয়ে অনেক দূরে এলাম—আর বছরে সেই তেলির ক্ষেতে (যেখানে নীল গাই দেখেছিলাম)যাবার সময় যে রকম সুঁড়ি পথ দিয়ে যেতাম সেরকম। তারপরে কেবলই সবুজ সমুদ্রের মতোশস্যক্ষেত্র—দিগ্‌দিগন্তহীন দূর, দূর সুদূরপ্রসারী আকাশ।অপূর্ব এ দিয়াড়ার দৃশ্য ! এরকম নীল আকাশ, এরকমপাহাড়, এরকম দূরপ্রসারী শ্যামলতার সমুদ্র আর কোথায়?মাঝে মাঝে বন্য শুয়োরে শস্যক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে। গভীরজঙ্গলের মধ্যে নির্জন ফসলের ক্ষেত। এই গভীর বনেরধারে একটা কাশের তৈরি কুঁড়ে—তাতেই চাষি রাত্রে শুয়েএই ভীষণ হিমবর্ষী রাত্রে ফসল চৌকি দেয়। ওরা পথ হারিয়ে গেল—মালী ঘোড়া নিয়ে আসছিল। সে বললে, এ কোথায় এলাম ?গোষ্ঠবাবুও দিশাহারা হয়ে গেল—আমিও প্রথমটা ঠাহর করতে পেরে উঠলাম না। পরে সিধা পথপেয়ে খানিকটা আসতে আসতে দূরে কতকগুলো কাশের ঘর দেখে আমি বললাম, এই বালা মণ্ডলের টোলা।গোষ্ঠবাবু বললেন, না। আমি কিন্তু আর খানিকটা এসেবাঁ-ধারে যে পথে লোধাইটোলা, ঘোড়া করে গিয়ে সেপথটা দেখতে পেলাম। তারপর হেঁটে খানিকটা পার হয়ে হুকুমচাঁদের বাসার কাছ দিয়ে মানুষসমান উঁচু রেড়িক্ষেতদিয়ে এলাম। মুকুন্দী ও জহুরি আজই বৈদ্যনাথ থেকে ফিরেএসেছে। প্রসাদ দিয়ে গেল। মুকুন্দীকে বললাম, তুমি আমার কাছে রাত্রিতে গল্প করবে। বড় আনন্দের দিনগুলো এসব।

অভিজ্ঞতায় এটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভালোলাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগহতে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মতো

ঠেকত।আজমাবাদকে তো মনে হত (১৯২৫ সালেও) সভ্যজগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোরকোনো নির্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।

আজ এমার্সনের "Immortality" প্রবন্ধটা পড়ে মনে হলআমার মনের কথা অবিকল তাতে লেখা আছে। কতদিনবসে বসে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশআছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারণ কি ?ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবন পথে দুশোতিনশো বছরের স্মৃতির ঐশ্বর্য কি, তা ভাবলেও পুলকেশিউরে উঠতে হয়—হাজার বছরের ?দুই হাজার বছরের ?বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের !

॥ নবমী, ৩১শে জানুয়ারি ১৯২৮।।

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি চলছিল। ভাবলাম বুঝি সকালে বটেশ্বরনাথ মেলা দেখতে যাওয়া হবে না। সকালে উঠে হু হু পশ্চিমে বাতাস দিচ্ছে। ভাগলপুরে রোদ্দুর উঠছে, মেঘ উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে পূর্ব-উত্তর কোণে। কন্টু মিশ্রযাবার জন্য তৈরি হল—অনেক লোক বটেশ্বরনাথে স্নান করতে চলছে। আমিও স্নান করে নিয়ে ঘোড়ায় উঠব।

ঘোড়া নিয়ে বালাটোলার মাঠে খুব যব খাওয়ালাম।সেখান থেকে খানিকটা যেতে ঘোড়ার পেটি আলগা হয়েগেল কিন্তু একটা লোককে ডাকিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়েআবার ঘোড়া ছাড়লাম। কলবলিয়ার মাহতাম্ সহিস দাঁড়িয়েছিল, তাকে দিয়ে পেটি কষিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম।তিনটাঙার পথটা বেশ ভালো—গাছপালা, আলোকলতারজঙ্গল, ছায়া—খানিকদূর যেতে যেতে মেলায় লোকসারবন্দী হয়ে যাচ্ছে দেখলাম—রাঙা কাপড় পরা মেয়েরদল, গরুর গাড়ির সারি। মেলায় পৌঁছে এদিকে ওদিকে খুব বেড়ানো গেল। পরে ঘোড়া ছেড়ে লোকপূর্ণ পথ দিয়ে রওনাহলাম। একস্থানে অতি নিরীহ গোবেচারি ভীতু প্রকৃতিরএকজনকে দেখলাম। ব্রহ্ম মণ্ডলের তাঁবুতে সে টাকা পয়সাকাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে মড়াকান্না কাঁদে—এ আগে কখনো দেখিনি। যখনকুড়ারী তিনটাঙার ওধারের পথে আছি, তখনই সূর্য হেলেপড়েছে—খুব ষাঁড়া গাছের ছায়া, পাশেই সবুজ গমক্ষেতসুগন্ধভরা। ঘুঘুপাখি বনের ছায়ায় ডাকছে—মনে হল কেমন সেই গত পঞ্চমীতে দেশের কুঠীর মাঠ থেকে কুল খেয়েএসে আজ পঁচিশ বছর পরে বাড়ির পিছনে বাঁশবনেবসেছিলাম। সে স্থানটিতে এরকম বাঁকা রোদ্দুরপড়েছে—রবিবারআজ যে, দেশে পঞ্চাননতলার কাছ দিয়ে হাট করে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বেগুনের কত দর আজহাটে। ঝুরি দোলানো পথ দিয়ে মাধবপুর নতিডাঙ্গার হাটকরে ফিরছে। আরো খানিকটা এসে একজন বললে, বড়রাস্তার খানিকটা গিয়ে পশ্চিম দিকে বাসনাপুকুরের রাস্তাপাওয়া যাবে। সে পথে আসতে আসতে জয়পাল কুমারেরবাড়ি। কাছের জঙ্গলে দুটো বন্যশুয়োর একেবারে এসেসামনে পড়ল ! তারপরই সোজা পশ্চিমমুখে পথ—ঘনছায়াভরা ওধার থেকে অস্ত সূর্যের রাঙা ম্লান আলো বাঁকাহয়ে মুখে পড়েছে। সেইঘুঘুর ডাক বড় ভালো লাগছিল।পথ ঠিক আছে কিনা জানতে সামনের একদল মেলাফেরতা যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললে, বাসনাপুকুর যাবে।একেবারে পড়লাম কলবলিয়ার ধারে। বাসনাপুকুর আসতে রাঙা সূর্যটা বহুদূরে দিয়াড়ার পেছনে অস্ত গেল। ওদিকেপূর্ণিমার চাঁদটা পিছনে চেয়ে দেখলাম বটেশ্বরনাথের পাহাড়ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। কলবলিয়া পার হবার সময়পূর্বদিকে পাহাড়ের ধূসর ছবি, ওপরে ওঠা পূর্ণচন্দ্রের দিকেচেয়ে চেয়ে বাড়ির ভিটের কথা ভাবছিলাম—সেই ভাঙাকলসি হাঁড়ি পড়ে আছে—কোন্‌কালের এই সজিনা ফুলভরাবসন্ত দিনের বার্তা। পিসিমার কাছে কাটানো সেই সব দূরেরদিনগুলো। ছোট্ট এক নোনা গাছের ধারের ওপরের ঘরে কত পূর্ণিমার রাত চলে যাওয়া। সামনে দিয়াড়ার মধ্যেএখান থেকে এখনোছ'মাইল এই রাত্রে যেতে হবে। ঘোড়াছেড়ে চলে এসে যখন নাঢ়াবইহারে পড়েছি তখন খুবজ্যোৎস্না ফুটেছে—বাঁয়ে বালিয়াড়ির ওপরে কাশবন একটা।আশেপাশে কাশের ঝাড়। নির্জন...ধু-ধুকরছে মাঠ আরকাশবন—কোনো দিকে মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পরেআন্দাজে ঘোড়া চালিয়ে এসে দেখি সামনে সেই পাড়-দেওয়াজলাটা পড়েছে। ঘোড়া টপকে পার হল—প্রতিমুহূর্তেই ভয়হচ্ছিল, বুঝি পথ হারাব। পরে জঙ্গলটা পার হয়েলোধাইটোলার নীচের তলাটার ধারে এসে গমক্ষেতে ঘোড়াছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না-ভরা জলাটার দিকে চেয়েরইলাম। চাঁপাপুকুরেরপুকুরঘাটে যাবার ইমাদি-ওয়ালাজমিটুকুতে ওই রকম জ্যোৎস্না পড়েছে। দীর্ঘ শস্যক্ষেতেরমধ্য দিয়ে ঘোড়া ছাড়লাম—যবের শিষে পা লেগে সিরসির্ শব্দ হচ্ছিল। লোধাইটোলা ছেড়ে ঘোড়া খুব দৌড়করালাম—Ranchman's Ride-এর মতো খুব। গম-যবেরক্ষেত দিয়ে এঁকেবেঁকে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম।কাছারি পৌঁছালাম সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে।

অপূর্ব জ্যোৎস্নার রাত্রি। দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসেআছি। সামনের কাশবনে জ্যোৎস্না এসে পড়ে অপূর্বদেখাচ্ছে। কাছারির অনেকে বটেশ্বরনাথে গঙ্গাস্নান করতেগিয়েছে, এখনো ফেরেনি। কত কি পাখি ডাকছে। বিহারেরদিক-দিশাহারা মাঠ, তার নির্জনতা, দু'একটা সাথীছাড়া বক, কাশবন, বালিয়াড়ি, অস্ত-সূর্যের রাঙা-আলো, অপূর্বজ্যোৎস্না,—এই সবের মোহ ক্রমে ক্রমে মাথায় পেয়েবসেছে। বড় আনন্দে দিন আজ কাটল। যাতায়াতে চব্বিশমাইল ঘোড়াচড়া হল আজ।

আজ জয়পালটোলার নির্জন ছায়াপথটা বেয়ে আসতেআসতে কেবলই মনে হচ্ছিল,—দূরে সেই হাটবার, পুবমুখোযাওয়া থেকে বহুদূর জীবনপথে চলেছি। সেই কুলক্ষেতে যাওয়ার দিন, সেই বাঁশবন পোড়ার দিনগুলো—কত কতপিছিয়ে পড়ে গিয়েছে। এই উদাস ঘুঘুর ডাক, রাঙাঅস্ত-সূর্যের রোদ, এই গতির বেগ—এ এক সঙ্গীত। অপূর্বজীবন-সঙ্গীতের নব মূর্ছনার মতো মাদকতাময়।

।। ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৮।।

কয়দিন ধরে ক্রমাগত জঙ্গলের পথে ঘোড়া নিয়ে বেরুই।উপরি উপরি দু'দিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেদিন বড় কুণ্ডীটার কাছে গিয়ে পথ হারানোতে রাজু মিশ্র পথ দেখিয়ে আনে। আর একদিন লোধাইটোলার রাস্তা না খুঁজে পেয়েগভীরজঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বালামগুলের বাড়ির কাছে এসে পড়েছিলাম—সে পথ দেখিয়েআনে।

আজ রামজোতকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণপুরে দামড়িকুণ্ডীরফসল দেখতে যাই। লছমীপুর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে সেখানথেকে গভীর মানুষসমান উঁচু কাশজঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথবেয়ে কুণ্ডীর ধারে যখন এলাম, তখন নির্জন জঙ্গলেরমাথায় পুবদিকে একটিমাত্র সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ওঃ, কি ঘন নির্জন জঙ্গলটা। শুধু উঁচু বালিয়াড়ি ও কাশের বন। ফিরে আসতে আসতে বেশ লাগল। দু'ধারে মানুষের গতিবিহীন নির্জন কাশ-ঝাউ এর বন। শুকনো কাশ-জঙ্গলের গন্ধেভরপুর, সোঁদা-সোঁদা বেশ লাগে। মাথার ওপরে তারাএখানে ওখানে—এখানে ওখানে উঁচু-নীচু ঢিবি, বালিয়াড়ি—অন্ধকার। বিশাল নির্জনতা, যেন চারপাশেরজঙ্গলে আকাশের নক্ষত্র-জগৎ তার রাজত্ব বিস্তারকরেছে—Vast wilderness !...তার মধ্যে ঘোড়ায় আমরাদুটি প্রাণী—ঘোড়াটা পথ দেখতে না পেয়ে টক্কর খাচ্ছে।গভীর জঙ্গলের দিকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল খুব ঘন নয়। চকচকে বালি, এখানে ওখানে বন-ঝাউ-এর ঝোপ—উঁচু-নীচু পিছনে কাশ-জঙ্গলের মাথায় তারাভরা পুবদিকের আকাশ, সোঁদা সোঁদা কাশ-বনের গন্ধ।

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটাকঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এইনির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপরি বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝেযেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়ি পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ওইরকম সুঁড়ি পথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানেযাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রেরঅন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এইসব।

দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবি লেবুফুলের সুগন্ধ, সজনেফুল পড়ে আছে, আমেরবউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়াবইছে—কোকিল ডাকতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে মনে পড়েগৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্তচোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতেআনা সন্ধ্যাদীপ...জানালায় ধূপগন্ধ...দেবতার মন্দিরে আরতি।

।। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৮।।

প্রায় একমাস পরে দিয়াড়ায় একঘেয়ে কাশ ও বন-ঝাউয়ের বনের নির্বাসন থেকে, বালি, সবুজ গময়বেরক্ষেত, ঘোড়ায় চড়া, লোধাইটোলার খুপরি—এসব থেকেআজ ভাগলপুরে এলাম। অনেকদিন পরে ভারি চমৎকার লাগছিল। সব যেন নতুন নতুন। কাল এসেই চণ্ডীবাবুর সঙ্গেবেড়াতে বার হলাম—ক্লাব থেকে মাঠে বেড়াতে গেলাম।কমিশনারের বাড়ির কাছটাতে যখন এসেছি তখন চণ্ডীবাবুরসঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনের বনগ্রাম স্কুল থেকে Homesick হয়ে বাড়িফিরতাম। ভরতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা, গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মতো লাগত। কালীরসঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হত, কতদিন পরে আবারএসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি। নভেলে এইসব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনেরঅভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকইযেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de forceহয়ে পড়বে।

আজ বৈকালে কলেজের ঘাসবনের পথ দিয়ে বেড়াতেগিয়ে প্রথম ফাল্গুনের গাঢ় স্নিগ্ধ আম্র-বাউলের সৌরভে, বাতাবি লেবুফুলের গন্ধে, অপরাহ্ণের ছায়ায় কত কথাইমনে আসতে লাগল। কি অপূর্ব জীবনপুলক। বহুকাল পরেদিয়াড়ার কাশবন থেকে এসে এ-কি অপূর্ব পরিবর্তন !চারধারে ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, ঝোপে ঝোপে ছায়া নেমেএসেছে—আম্ব-বউলের গন্ধে, পাপিয়ার ডাকে বাতাসঅবশ। লেবু ফুলের গন্ধে মনে পড়ে, কতকাল আগে কোনোকৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপলাগয়লার বাড়ির সামনে চড়কতলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাক্, তারপর লাইনের ওপরকার সাঁকোর ওপর গিয়ে বসলাম, মনে হল এই অপূর্ব শিল্প যাঁর হাতের—এইপৃথিবী-পারের নক্ষত্রজগতে হয়তো কত উন্নত বিবর্তনেরজীবজগৎ আছে। তিনি তাঁর অপূর্ব শিল্পপ্রতিভা সে সবউন্নততর জগতে না জানি কত অপূর্বভাবে ফুটিয়েতুলেছেন ! অনন্ত সৌন্দর্যভূমি, এই নক্ষত্রজগৎ—কত এধরনের উন্নত বসন্ত, আরো কত অজানা ঋতুবিলাস তারধূলায় ধূলায়। যুগে যুগে যে সব শিল্পী, কবি এই সৌন্দর্যসৃষ্টির গান করে গিয়েছেন—গ্রীকযুগ, রোমকযুগ, রামায়ণ, কালিদাস, শেলি, শেক্সপিয়র, কীট্স্, রবীন্দ্রনাথ—এইসবদ্রষ্টাদের কথা ভাবি। ভগবানের সৃষ্টিকে এরা আরো কতমধুময় করেছে। ওইসব জগতে কত উন্নত ধরনের কবি, দ্রষ্টা, ভাবুক আছেন—কে জানে ?আমি বেশ কল্পনা করতেপারি, নির্জন জ্যোৎস্নাময়ী, অজানা গ্রহ-জগতে তাঁদেরকল্পনায় সে অপূর্ব বিলাস।

॥ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮।।

এখানকার এক একটা দিন এক একটা সম্পদ হয়েউঠছে—কলকাতার এরকম দিন কটা আসে ?আমারই বাএর আগে কটা এসেছিল ?স্কুল-কলেজের রুটিনবাঁধা কাজবা স্কুলমাস্টারির রুটিনবাঁধা কাজের সময় এসেছিল বটে দিনকতক, League-এর কাজের সময়। কিন্তু সে-ও বড়ভ্রমণশীল, বেদুইনের মতো জীবন ছিল বলে সে-ও ততটাভালো লাগেনি।

আজকালকার প্রত্যেক দিনটি এক একটা উৎসব দিনেরমতো সুন্দর। এত সুপ্রচুর অবসর এত বৈচিত্র্য আর কখনো কী জীবনে পাব ?

আজ তিনটার সময় চণ্ডীবাবু এল, তার সঙ্গে বার হয়েগেলাম—প্রস্ফুট আম্রমুকুলের গন্ধ-ভরা বৈকালের বাতাসেরমধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রোমান ক্যাথলিক গির্জাটাতেঢুকলাম। দুধারে বৈকালের ছায়ায় সুন্দর গাছগুলো।আমরুল, কামিনীফুল, আমগাছ, দু'চারটা বিলাতি ফুলের গাছ, চিনি না। গঙ্গার ধারে কেমন সুন্দর বাঁশঝাড়, গোলাপের বাগান; Priest-এর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা হল। রোমান ক্যাথলিক পবিত্র Beautitude সম্বন্ধে আমাকে যা বোঝালেন তা অন্যভাবেআমি নিজের চিন্তার মধ্যে পেয়েছি। মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি বেড়ে যাবে, যাতে করে সে ভগবানের বিরাটসত্তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বিরাটের আনন্দ পাবে।বললেন, Inquisition সম্বন্ধে বিশ্বাস করো না—ওটা আমাদের শত্রুদের লেখা, অনেক সত্য আছে বটে কিন্তুঅতিরঞ্জনও খুব। বললেন, আমরা Truth সম্বন্ধে Controversy করি না—দুটো একটা Doctrine যারা বাদদিয়েছে তাদেরও বাদ দিয়েছি। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন (Henry VIII)—সেই জন্যে আমরা ইংলন্ডের মতো দেশকে ছেঁটে বাদ দিলাম !St. Lewis বিশ্ববিদ্যালয়েরগ্র্যাজুয়েট, এতদূর এসেছেন, বললেন, আমরা আর দেশেফিরব না, মৃত্যু হয়তো এখানেই হবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে কলেজের পথে অন্ধকারঘনআমবনটা দিয়ে রেল লাইনে এসে উঠলাম। জ্যোৎস্নাউঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশেরতালতলায় গত ভাদ্র মাসে কল্পনা করেছিলাম দুর্গার তালকুড়ানো, শৈশবে তাল পড়েথাকলে গাছতলায় কি আনন্দহত। কি অপূর্ব আম-বউলের গন্ধ-মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা।সাঁকোটার উপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করে স্টেশনে এলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—তিনিসংকীর্তন করতে যাচ্ছেন স্টেশনের বাসায়। বাজারে একটাশার্ট কিনে গ্রামোফোনের দোকানে রবি ঠাকুরের আবৃত্তিশুনলাম—আজি হতে শতবর্ষ পরে। বৃদ্ধ কবিবরের গম্ভীরগলায় উদাত্ত সুর বড় ভালো লাগল। তারপরে চণ্ডীবাবুচলে গেল তার বাড়ি, আমি আসতে আসতে পথেভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। ভোলাবাবু দীপুবাবুর বাড়ি যাচ্ছেন Electric fittings-এর Canvass করতে। তাঁকে বললাম, দীপুবাবু এখন ব্রীজ খেলতে ব্যস্ত, সকালে না গেলে কিদেখা হবে !

দিনটা বেশ কাটল।

॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮॥

সকালে নায়েবের সঙ্গে গেলাম কমলাকুণ্ডু। বেশ ঘোড়াছুটিয়ে সকালের হাওয়ায় রণচুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়েগেলাম। কয়েকদিনের জড়তাটা কেটে গেল। ক্ষেতে ক্ষেতে যব পেকেছে। পাকা ফসলের সুগন্ধ চারধার থেকে

পাওয়াযাচ্ছে। কখনো আমি ঘোড়া ছোটাই, কখনো নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছোটান। ফুলকিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জঙ্গল থেকেএকটা বুনো মহিষ বার হল। সেটার মূর্তি দেখেই আমিবললাম, এটা মারতে পারে, ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়েমাটি খুঁড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। যদি তেড়ে মারতে আসে—দুজনে ঘোড়া ফিরিয়ে চালিয়ে খানিকটা এসে আবার দাঁড়িয়েগেলাম—ততক্ষণে মহিষটা চলে গিয়েছে। তারপর আমরাঘোড়া ফিরিয়ে কমলাকুন্ডুপৌঁছলাম। খুব রোদ চড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ওই আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধু-ধুবালিয়াড়ি, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড়ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ।গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসরধরে কত ফুল ঝরে পড়েছে—কত পাখি কত বনঝোপআসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরাজাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসিকান্নারমেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ওই ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ওই বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়েএসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ওই শান্ত নদীর ধারে ওই আকন্দ ফুল, ওই পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখব, নাম হবে ইছামতী।

সন্ধ্যার পর কমলাকুণ্ডুথেকে বেরুলাম। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বালুর উপর চকচকে জ্যোৎস্না। জয়পালের নৌকাতে পার হতে হতে বড় ভালো লাগছিল আরভাবছিলাম—আজ বৃহস্পতিবার, এই জ্যোৎস্নায় আমাদেরদেশে দারিঘাটের পুলের কাছ দিয়ে এসময়ে হাট করে কেউ ফিরছে। রাত্তিরে কারা মাছ ধরছে—রাজু সিং জালসমেতধরে নিয়ে এল, ছেড়ে দিলাম। তারপর ফিনিকফোটাজ্যোৎস্নারাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েবপাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানেওবেলা মহিষ দেখেছিলাম, ওখানে এলাম। মনে হল দূরে আমার বাড়ি। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়ি-কলসিগুলি পড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মারহাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলেভর্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না।হরি রায়ের জমিটুকুনেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধকরেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলেতাঁরঘরকুনোগেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সেদেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্বতে ঘোড়ায়স্টিমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর। মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প জিনিস সাজিয়ে গুজিয়ে চালিয়েগিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশি তারা কিছু জানেনা, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ওইবাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলার শান্ত জীবনযাত্রা সংকীর্ণছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাইতাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তার সংসার উল্টেই গেল—তাঁরসংসার—আমার সংসার নয়।

মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এইজীবন ওই পর্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্নারাত্রি, কতএরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।

যে যাই ভাবুক, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধুবিশ্বাস বলেনয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ওই আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মতো আর কোনো দেশেজন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করবো—পৃথিবীমায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসব।

সে যাক, দুর্বল-দৃষ্টি লোকে ভাবে আমি হয়েছি Theosophist.

জীবন ভোগ করতে হলে হই হই করে কাটিয়ে দিলে ভোগ হয় না—চাই চিন্তা, ধীর চিন্তা। গভীর চিন্তাতেজীবনরহস্যের গভীর অনুভূতি হয়। সেই ছেলেবেলায় এইফাল্গুনে বেল কুড়ানো, চড়কগাছ খেলা, সেই মা, জেঠিমা, নেড়া, ভরত—সে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই চাঁপাপুকুরের ধার, সেই যে কাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম, সেখানেও আজকার মতো জ্যোৎস্না উঠেছে—সে জীবনওশেষ হয়ে গিয়েছে।

আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তাহলে ভারি চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্নারাত্রি ফুজিসান পর্বতে, কি প্যারিসের কোনো বুলেভার-এর ধারে, কি সমুদ্রের উপরজাহাজে, কি ইজিপ্টের লুক্সর, কি কোণারকের মন্দিরেরমধ্যে, নিউবিয়া মরুভূমির উপরে, এইসব ভাবি।

॥ ১লা মার্চ ১৯২৮॥

কাল সন্ধ্যার পর ভাবলাম, দোলপূর্ণিমা রাত্রে ঘোড়ায়বেড়াতে হবে। খুব বেলা গেলে বেরিয়ে রামজোতেরবাগানের কাছে যেতেই জ্যোৎস্না উঠে গেল। রামচন্দ্রসিং-এর সঙ্গে কথা কয়ে বড় কুণ্ডীটার ধার দিয়ে নির্জনকাশ-জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। খুব জ্যোৎস্নাউঠেছে। নির্জন। বহুদূর পর্যন্ত কেউ কোথাও নেই। শুধুকাশ-জঙ্গল, আর জলের ধার। লোধাইটোলার জঙ্গল পেরিয়ে জলাটার ওপর বড় সুন্দর জ্যোৎস্না পড়েছে—খানিকক্ষণ ঘোড়া ইচ্ছামতো ছেড়ে দিয়ে বসেরইলাম। তারপর খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। সারাদিন ভীষণ পশ্চিমা বাতাসবয়েছে—এখনো সমানে বইছে। ধুলো-বালিতে চারধারভরপুর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, বালি-ধুলোর পর্দায় ম্লান করেদিয়েছে—ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না। সামনের ধু-ধুকাশবনগুলো জ্যোৎস্নায়অদ্ভুত দেখাচ্ছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়েপড়েছে—বহুদূর জঙ্গলে আগুন লেগেছে, সেদিকেরআকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। আর মাঝে মাঝে দাউ দাউকরে লকলকে আগুনের শিখা খুব উঁচু হয়ে আকাশটাকেলেহন করতে ছুটছে।

বাংলাদেশের শান্ত দৃশ্যের কাছে এই নির্জনতা বাত্যাক্ষুব্ধধু ধু জ্যোৎস্নাভরা মাঠ-জঙ্গলের দৃশ্য, ওই বনের আগুন, এই ধুলোভরা আকাশ কী অদ্ভুত মনে হয় !

॥৬ই মার্চ ১৯২৮॥

রামবাবুর ঘোড়াটা চড়ে বড় আরাম পাওয়া গেল। কালবৈকালে, পরশু রামপুরের মাঠে একেবারে সোজা কদমচালে চলে গেল—আজ তেলির সাক্ষী দিতে নওগাছিয়া হয়েএলাম—কি সুন্দর, লছমীপুরের ধাপটার কাছে এসে দেখিরূপলাল সবে ধাপটা পার হচ্ছে, লোকারা চামার মোট নিয়েপিছনে। ঘোড়াটা হু হু করে উঁচু পাড়টার ওপর উঠে গেল—কি সুন্দর কদমই ধরলে ! এরকম ঘোড়া চড়া কখনো হয়নি, এ কয়দিন বেশ হল। নওগাছিয়া ইঁদারার কাছে ঘোড়াজল খেলে—তারপর একেবারে রামবাবুদের গোলা।তারপর ভাগলপুরে এসেই চণ্ডীবাবুদের বাড়ি এলাম।অনাদিবাবুর সঙ্গে গল্প করলাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনেহল সেই পাশের পথটা—পিসিমা জল নিয়ে প্রথমএল—আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে সেই প্রথম এলাম—দেখতে দেখতে কতকাল হল।

Goethe-এর কথাটা ভালো লাগে—Those who cannot hope about a future life are already dead in this life. সন্ধ্যাবেলা অনিলবাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দদাসেরযাত্রা শোনা গেল।

॥ ১৪ই মার্চ ১৯২৮।।

আজ ভণ্ড সিং-এর জাহাজে বিকালের দিকে ভাগলপুরথেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে এলাম মহাদেবপুর ঘাট। মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—মুকুন্দ, মাগব, পূরণ, ছটু সিং এবং সিপজী ও রূপলাল—এই কয়জন সঙ্গে, অন্ধকারের মধ্যেঘোড়া চালিয়ে আসতে সাহস না পেয়ে আস্তে আস্তে এলাম। বালির চরে আসতে না আসতে অন্ধকার হয়েগেল—বাঁ-ধারে পর্বতের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। গঙ্গারঘড়িয়ালগুলো আমাদের পায়ের শব্দে হুড়ুম হুড়ুম করে জলেনেমে গেল। আমি নেমে হেঁটে চললাম। মুকুন্দকে বললাম, গল্প বলো—সে গল্প আরম্ভ করে দিলে। খানিকটা এসেদিক্‌ভ্রম লাগল বালির চরের ওপরে। এত ঘন অন্ধকার যে, দু'হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না—আমার বড় লণ্ঠনটাজ্বেলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে—এদেশে আলেয়াকে রাক্ষসেরআলো বলে। কত ভূতের গল্প হল।

'দেবতার ব্যথা'য় এইরকম লিখতে হবে যে, কোনো উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম শূন্য বেয়ে দূর গ্রহেরউদ্দেশে যাত্রা করে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম অন্ধকারেতাদের যাত্রা, দুর্জয় সাহসী Pioneers !

॥ ১৫ই মার্চ ১৯২৮।।

আজ বিকালে ঘোড়া করে পরশুরামপুর কাছারি এলাম। কুলিরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। মুনেশ্বর ধরে-বেঁধেএকজন কুলিকে শেষে জোগাড় করে তাকে দিয়ে টেবিল চেয়ার পাঠালে। আমি একটু বেলা গেলেই রওনা হলাম। কাল Imperial Library থেকে Conrad-এর বইখানাপাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেইটা পড়ছিলাম। আজকালইসমাইলপুর

কাছারিটা বড় সুন্দর লাগে। দুধলীঘাসের ফুল, কন্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমুলোর ফুল, আকন্দের ফুল।বৈকালে আজ বেড়াতে গেলাম, ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা শস্যেরগন্ধ, কাট্‌নি মজুরেরা ফসল কাটছে। কাছারির ওপর দিয়ে দু'বেলা মেয়েমানুষেরা যাচ্ছে—সকালটা বেশ লাগে। কিঅদ্ভুত দুপুরটা—দুপুর রোদে ঝাউ ও কাশ বন যেন কোনো রহস্যের গভীর মায়া-যবনিকায় ঢাকা থাকে। কত অসম্ভবআর আজগুবি চিন্তা মনে নিয়ে এসে ফেলে। বিহারের ওইসুদূরপ্রসারী প্রান্তর দূরের রৌদ্রে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট নীলপাহাড় দুটো—পীরপৈঁতির পাহাড়শ্রেণী, দিলবরের খুপরিরপিছন দিয়ে, রামবাবুদের বাসার পিছন দিয়ে একেবারেএতমাদ্‌পুরের কাছারির দিকে বিস্তৃত থাকে। বড় মৌন, রহস্যময় মনে হয় এই খররৌদ্র প্লাবিত চৈত্র-দুপুর।

আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুরথেকে—বললে, কুলিরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ ! বার হয়েই লোধাইটোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবারসেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ, এই জীবন। ভাবছিলাম সেই কত দিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমাদের পাশের পথটা দিয়ে—আমি ও বাবা এসেছি মামার বাড়িথেকে, পিসিমা কঞ্চিঘাটে—সেই সব দিনগুলো। নেড়ারবাবা এখনো নতিডাঙা মাধবপুর করে বেড়াচ্ছে—আরআমাদের বাংলার গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। কচিপাতা গজিয়েছে, কোকিল ডাকছে, কাঞ্চনফুল গাছ আলোকরেছে...অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় ঝোপে ঝোপে সুমিষ্ট বনফুলেরবাস—বেলের পাতা—চড়কের ঢাক—গোষ্ঠবিহার—কোকিলের কুহু, পাপিয়ার মনমাতানো সুর, রামনবমী।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে পড়লাম—রাজু সিংএপারেই দাঁড়িয়ে ছিল—জল পার করে ঘোড়া নিয়ে গেল।দুবে এসে অনেক দুঃখ করতে লাগল যে, সে তার মেয়েরবিয়ে জমাদারের সঙ্গে দেবে না, তবুও কেন নায়েব তারজন্যে পীড়াপীড়ি করছে।

॥২০শে মার্চ ১৯২৮॥

পরশুরামপুর কাছারিতে অনেকদিন পরে বাস করছি।সেই প্রথম ভাগলপুরে এসে হেমন্তবাবুর আমলে কিছুদিনছিলাম বটে, তারপর সেই একবার এসে বস্তির মধ্যে ঘরটায়ছিলাম। অনেকদিন পরে এখানে কিছুদিনের জন্যে বাসকরতে এসে বড় ভালো লাগছে। আজ সকালে উঠে দেখিআকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বড় মন খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু একটুবেলা হলেই মেঘটুকু কেটে খুব কড়া রোদ উঠল। গরমও।গৈফুর তহশিলদারের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধগভীর শীতল জলে অবগাহন স্নান করে বড় আরাম পেলাম বহুদিন পরে। স্নান করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছামতীর ঘাট থেকে এই সুন্দর স্নিগ্ধচৈত্র-দুপুরে কচিপাতা ওঠা বন-ঝোপের পাশ কাটিয়েবাঁশবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে ফিরেআসা। বালি তেতে বড় গরম হয়েছে—পা পুড়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ি তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম। জয়পাল সাধুর বাড়িরকাছে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারবাবুরবাড়ি কোথায় ?সে কথা বললে না। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে রাস্তা বলে দিলে। এর ওর বাড়িরসামনে দিয়ে একটা বাড়ির কাছে এলে, একটা ফর্সামতোছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কেউ নেই। সেখানেদেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যেতৌজির দিন কাছারি গিয়ে কানের পোকা বার করবারজোগাড় করেছিল। ফিরলাম যখন বেলা পড়ে গিয়েছে।বহুদিন দিয়াড়ায় থাকবার সময় চোখে যখন হঠাৎ এই বড় বড় বট অশ্বত্থগাছ দেখি তখন একঘেয়ে কাশ-ঝাউবনের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনায় মনে হয়, যেন কোন্ অঙ্গারযুগেরপৃথিবী থেকে হঠাৎ উচ্চ বিবর্তনের জগতে এসে পৌঁছেছি।

স্নিগ্ধ বৈকাল। ঝোপে-ঝোপে পাখি কিচ্ কিচ্ করছে, আলোকলতা দুলছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এসেপথের ধারে একটা রোদপোড়া ঘাসেভরা মাঠ পেলাম—বড়ভালো লাগল। মাঠের একটা বড় অশ্বত্থ গাছে নতুন কচিরক্তাভ পাতা গজিয়েছে। অনেক শকুনির বাসা—মাঠেঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এই স্নিগ্ধ বৈকালেআমাদের ইছামতীর ঘাটে পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা সব গাধুয়ে আসছে। যারা ছিল বিশ বছর পূর্বে নব-বধূ তারা আজপ্রৌঢ়া, জীবনের কত সুখ-দুঃখের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সেই কুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায়বসা—পিসিমার সেই কঞ্চিকাটা বাঁশবন, মার হাতের হাঁড়িকলসি পোড়ো ভিটায় পড়া—মার হাতের পোঁতা সজনেগাছ—এই স্নিগ্ধ বৈকালে কচিপাতা ওঠা অদ্ভুত ধরনের আঁকাবাঁকা গাছটার সীমারেখার দিকে চেয়ে মন-মাতানোকোকিল, পাপিয়ার উদাস ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলজীবনটা কী অপূর্ব করুণ সঙ্গীত। সন্ধ্যার পূরবী গৌরীরাগিণীর মতো নির্লিপ্ত নির্বিকার, অথচ চারু-শিল্পের চরম দান। বিহারের এই ধু-ধুউদাস মাঠ প্রান্তর, দূরপ্রসারী দিক্‌চক্রবাল, দু'একটি পুরানো শিমুলগাছ—রক্ত সূর্যাস্ত বড়ভালো লাগে। দূরের নীল

পাহাড়টা—যেন এক মায়ারাজ্যেরসীমা এঁকেছে সন্ধ্যাধূসর পূর্ব আকাশপটে। সারাদিনেরখররৌদ্রদগ্ধ মাটির সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া গন্ধ, তারপরেইকলবলিয়ার ঠাণ্ডা জলের গন্ধ—বড় আনন্দ পেলাম আজ।

এখানকার জলের গুণ বড় ভালো দেখছি।

দুপুরবেলা কমলাকুণ্ডুর কাছারিতে বসে বসে লিখি—খরপ্রচণ্ড চৈত্র-রৌদ্র—পাশের ঘর যেন আগুনের মতো দাউদাউ জ্বলে—হু হু পশ্চিমে হাওয়া বয়, আমার খোলা দরজারঠিক সামনে দূরের ওই কচিপাতা ওঠা শিশুগাছটির দিকে ওতার পেছনকার উটের পিঠের কুঁজের মতো ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কেবল মনে পড়ে, এই মধ্যাহ্নেবাংলাদেশের কত অজানা মাঠ—ঘেঁটুফুলে ভরা, উলুখড়েভরা, কত মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো, রাঙাফুলে ভরা শিমুলগাছ। এ-গাছের ও-গাছের তলায় যেন বসলাম।অজানা গ্রাম্যপথে মাঠের ধারের বনে গাছতলার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসতে বসতে পথ হাঁটা, রেলপথ থেকে বহু বহু দূর সব গ্রাম—কত দরিদ্র পল্লীতে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা। কতঘরে কত সুখ-দুঃখ—কত বধূ কত কন্যার শান্ত চোখ।

॥ ২১শে মার্চ ১৯২৮॥

আজকার বেড়ানোটা সবচেয়ে অপূর্ব। কলবলিয়া পারহয়ে মুকুন্দপুরের পথে বেড়াতে গেলাম। বেলা একেবারেগিয়েছে। বাঁ-ধারে কলবলিয়ার ওপারে সিমানিপুরের দিয়াড়াতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলাকুণ্ডুপার হয়েই পথের ধারে বড় বড় শিমুল পাকুড়গাছ, ঘেঁটুফুলের তেতোগন্ধ—বাঁশঝাড়, কোকিলের ডাক, গ্রামসীমার গাছপালার মধ্যে পাপিয়া ডাকছে। বসন্তের দিনে বেশ লাগল। অজানা পথে আকন্দফুল, কচি ওড়াফুলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়েযেতে এমন লাগছিল। যেতে যেতে একটা গ্রামপড়লো—লবটুলিয়া, পরে বোচাহি। পথে কীর্তনিয়া বৃন্দাবন হেঁটে আসছে—বললে, নাগরা গিয়েছিল কীর্তন করতে।আমি বললাম—রামবাবুর ওখানে ?তারপর সে চলে গেল।ক্রমেডিম্‌হী পেলাম। তারপর চৌধুরীটোলা। সেইখানটাগিয়ে পথের ডানধারে একটা সরু মাটির পথ—দু'ধারে ঘনশিশুগাছের শ্রেণী—ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়াভিটামতো—ঘেঁটুফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটুফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটাপাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে পড়ল অনেকদিন আগে সেইযে গিয়েছিলাম বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ি, ওদিকে কোদ্‌লার ধারে একটা পুরানো ভিটেতে—সেইকথা মনে পড়ল। ঠিক যেন সেই স্থানটা—এ স্থানটা ঠিকযেন বাংলাদেশ! বিহারে এতদিন পরে বাংলার সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কোন্ বিদেশেআছি—আজ আমার দেশে বৃহস্পতিবারের হাট, পঞ্চাননতলা দিয়ে মনো শ্যামাচরণ দাদা ফণীকাকা হাট করে ফিরছে—কেউ জিজ্ঞাসা করছে—আজ বেগুনের সের কত ?তুমি বুঝি এখন হাট থেকে এলে ?আমার মায়ের হাতেপোঁতা সজনে গাছ—ভাঙা কলসি—হরি রায়ের বিষয়—

সে সব থেকে কতদূরে বিদেশে ঘোড়া করেবেড়াচ্ছি—অজানা গ্রামের পথে পথে, অজানা ঘেঁটুফুলের ঝোপের ধারে ধারে—আমার কি সাজে কলকাতায় অফিসেবসে বদ্ধ হাওয়ায় কাজ ?আমার জন্যে এই আকাশ ওইসূর্যাস্ত ওই নদী ওই মুক্ত-হাওয়া, স্বাধীনতা—অপূর্বঅপরাহ্ণ ! ডেস্কে বসে শুধু লেখবার কাজ আমার নয় !

॥ ২২শে মার্চ ১৯২৮।।

কাল বৈকালে পরশুরামপুরে দিয়াড়ার লবটুলিয়ার এপারে খুব দাঙ্গা হয়ে গেল। দাঙ্গার হই হই শব্দ কাছারি থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠানোহল। খুব ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিলে—আজ সকালেআমি ও নুটু ঘোড়া করে জঙ্গলের পথে ইসমাইলপুরে চলে এলাম। পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দাতে বসলাম। দূরে নীল পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনেহল, সুন্দর ইছামতী—আমাদের গ্রাম—এই বৈশাখের সুগন্ধভরা প্রভাত, অপরাহ্ণ, সেই আম-জামতলা, মাঠ, নদী—ঠাকুরমাদের বেলতলাটা—বেলফুলের গন্ধ—কতদিনেরকত আনন্দ।

খুব জ্যোৎস্না-বড় সুন্দর লাগল।

।। ২৮শে মার্চ ১৯২৮।।

পরশু গেল রামনবমী। বসে বসে ভাবছিলাম এই দুপুরেএতক্ষণে পা ছড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সব খেতে চলেছেকারা ?রাখাল রায়, হরিশ বাঁড়ুয্যে, বাবা—এঁরা নন। তাঁদেরপৌত্রের দলেরাই বেশি। সন্ধ্যার সময় বাদা ময়রার দোকানখুলবে—এই জ্যোৎস্নায়। জীবনটা একটা অবান্তর রূপকথারকাহিনীর মতো মধুর ও রহস্যময় ঠেকে।

তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে সেই চাঁপাপুকুরের নিমন্ত্রণ খাওয়ার বাড়ি, আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ির ছাদ মনে হয়। সমুদয় আকাশ, তারাগুলো অপূর্ব রহস্য-ঘেরা মনেহয়। কাল গেল '১লা এপ্রিল'। সেই "১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল ঊষালোকে" ছেলেবেলাকার কথা। কাল নুটু চলে গেল এখান থেকে। বড় পশ্চিমে বাতাসটা দিয়েছেকাল।

॥২রা এপ্রিল ১৯২৮॥

আজ গুডফ্রাইডে। অনেককাল আগে মনে পড়ে এইদিনবনগাঁ স্কুল থেকে সন্ধ্যাবেলা আমি আর ভরত বাড়ি চলেএসেছিলাম। সেইরাতেই যেন ভরত মারা গেল। কতকালেরকথা সে সব, তবু মনে হয় সেদিন। তারপর কত গুডফ্রাইডেকেটে গেল। কালের চক্রটা ভয়ানক বেগে ঘুরে চলেছে।

এইমাত্র হঠাৎ বড় ঝড় এল। আমি আর গোষ্ঠবাবুআমার ঘরের সামনে বসে আছি—এমন সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘের পাড়। হাওয়াটা যেন একটু জোর—এমন কি আমরা বলছিলাম, বেশ হাওয়াতো ?দেখতে দেখতে মেঘের পাড়টা গুমরে উঠলো—তারপরই হু হু করে ঝড়টা এল—সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ওদিয়াড়ার বালির চরের সমস্ত বালি উড়ে আসতেলাগল—কমে না—এক এক দমকায় আমার ঘরখানা তোকাঁপতে লাগল।

॥ ৬ই এপ্রিল ১৯২৮॥

আজ খুব বর্ষা ঘনিয়ে এল ভাগলপুরের দিক থেকেবিকেলটাতে। ছেলেবেলাকার মতো কালবৈশাখী যেন। ঘনকালো মেঘটা ঘুরে গঙ্গার দিক থেকে পৈঁতির পাহাড়ের দিকেছড়িয়ে পড়তে লাগল, কালকের সকালে যে চারধারে পরিষ্কার বাদামে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল বংশী, জামালপুর—সব ঢেকে দিলে।

ঘনান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল এই তোজীবনের সম্পদ—হয়তো তিন হাজার বছর পরে আবারপৃথিবীর বুকে আসবো—তিন হাজার বছর আগের ষাটবছরের প্রতিদিন কি অবদানে, সুষমায়, স্মৃতিতে মণ্ডিত হয়েগিয়েছিল—কত কালবৈশাখীর মেঘে, কত চোখের হাসিতে, চাঁপাফুলের গন্ধে, কত দুঃখে, কত গানে—সে সব তখন কি মনে থাকবে ?এই একটা একটা দিন জীবনের মণিহারে গাঁথাঅপূর্ব সম্পদ—প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ দায়বদ্ধতা—সব।দূরে হয়তো মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছে এতদিনে বনের মধ্যে ডাঁটা ধরে আছে—কে জানে ?হয়তো কেউতুলে নিয়ে গিয়েছে—নয়তো নয়। গতির অপূর্ব বিচিত্রতা আমি লক্ষ করছি—সে আমার চোখে পড়েছে।

বসে আছি—কিন্তু কি বিশালবেগে চলেছি।

॥ ৯ই এপ্রিল ১৯২৮॥

কাল থেকে কি একরকম অজানা খুশিতে মন থেকে থেকে ভরে উঠছে—ওই দূরের নীল পাহাড়টার পাশের দিকেচেয়ে থাকলেই সে আনন্দটা পাই। কাল তাই ভাবছিলাম, হে বিশ্বদেব, কী অপূর্ব কাণ্ড সৃষ্টিই করেছ এই মানুষেরজীবনে, এই বিশ্বে !

আজ সকালে উঠে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে কালীঘরে কলসি উৎসর্গ করে ভারী তৃপ্তি পাওয়া গেল। শুয়োরমারি থেকে সিদ্ধেশ্বর নাপিতকে রামচরিত ডেকে আনলে, কারণ মোহনের অসুখ করেছে। তারপর খাওয়ারপর একটু ঘুমোনো গেল। বড় গরমটা পড়ে গিয়েছে।

দুপুরে রেড়িক্ষেতের কাছটা থেকে ফিরে আসতে হঠাৎমনে হল আজ চড়ক, তিরিশে চৈত্র। অমনি সারা গা'টা যেনশিউরে উঠল—শত-স্মৃতির দ্বার এক ঝাপটা হাওয়ায় খুলেগেল। দুপুরের খররৌদ্রভরা আকাশের তলায় হলুদ রং-এরবনমূলার ফুল, আকন্দফুল, বেগুনী-কন্টিকারী ফুল পোড়োজমিটাতে অজস্র ফুটে অনন্তের সন্ধান এনেছে—আমার খড়ের বাংলো-ঘরের পিছনে। ওইখানটায় দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মনে পড়ল, এতক্ষণ আমাদের চড়কতলায় হয়তো দোকান-পসার বসেগিয়েছে—হয়তো সেই গাছটায় ছেলেবেলার মতো কাঁটাভাঙছে—কাল গিয়েছে নীলের দিন। হয়তো গাঁয়ে যাত্রাহবে—হয়তো কত আনন্দ হচ্ছে—পুরোনো দলের কেউকাঁটা ভাঙছে না। নতুন দলের ছেলেপিলেরা, শত জেলেএখনো বেঁচে আছে।

আমাদের বাড়ির ভিটেটাতে নতুন পোঁতা পড়ে আছে, কতকাল আগের এক নববর্ষের জলদানের চিহ্ন—দাতা হয়তো বেঁচে নেই। কত যত্নে তোলা ছিল—সেই সজনেগাছটার মতো, কত যত্নে সঞ্চয় করা। সামনে বাঁশতলার ভিটেটাতে যে-

সব খোলা-খাপড়া পড়ে আছে, কতকালআগেকার কোনো বিস্মৃত নববর্ষের ঘটদানের ভাঙা কলসিরখোলা-খাপরা সে-সব ?ভাবতেও—এতকালের অনন্ত-প্রবাহেরচিন্তা করেই গা কেমন শিউরে ওঠে।

সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলোআছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকত, তবে কিছু না। মানুষ আছে বলেই এইসৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহে-নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে-সব স্থান মরুভূমির নয়—তরুণ-মুখের হাসি-কান্নায়, সে-সব অজানা দূরের জগৎও জাগ্রত প্রাণস্পন্দনে ভরা, সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বনপর্বতের নির্জনতায় বিরহী একা বসেপ্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন, দেশকর্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েইভগবানের অপূর্ব কাব্য। এর সঙ্গে জীব-জন্তুর, গাছপালারদুঃখ তাঁর মনে আসে যদি, তবে তাঁর আনন্দের তুলনাকোথায় ?

।। ১৩ই এপ্রিল ১৯২৮। ৩০শে চৈত্র ১৩৩৪॥

নববর্ষের দিনটা।

অনেককাল আগের শৈশবের সেই-সব কালবৈশাখীরদিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার !আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘরের কোণে বসা, কাঁথা পাতা, শিল-পড়ার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন ঘন চাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক, বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনে পড়ল, কত কথা। অনেক দূরে আজ আমারগ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠবিহার, ছেলেবেলার মতোমেলা হচ্ছে, কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কতমাটির ঘর থেকে এসেছে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেছে—পঁচিশবৎসর আগের মতো হয়তো। পঁচিশ বৎসর আগের যে বালকের কথা মনে হয়, যার মনে কালবৈশাখীর অপূর্ব বার্তাআনত !

ত্রিশ পঞ্চাশ একশো হাজার তিন হাজার বছর কেটেযাবে। তিন হাজার বছর পরেকার যে বাংলার ছবি আমিএই মেঘান্ধকার নির্জন সন্ধ্যাটিতে বাংলা থেকে দূরের দেশেএক জঙ্গল—পাহাড়ের ধারে ঘরটিতে বসেমনে আনতেচেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, যার বিষয়েআমরা কল্পনা করতে সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরনেররাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেছে। হয়তোইংরেজ-জাতির কথা, প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মতোইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেল স্টিমারএরোপ্লেন টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব-সভ্যতারকৌতূহলপ্রদ নিদর্শন-স্বরূপ—সে ভবিষ্যৎ যুগের মানবেরচিত্রশালিকায় রক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বাংলাভাষা তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্তহয়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ভাষা প্রচলিত হয়েছে। বহুদূর ভবিষ্যতের ছবি !

তখনো এইরকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকমমেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরসিক্ত ঠাণ্ডা জলো হাওয়া নিয়ে তীক্ষ্ণবিদ্যুৎচমক নিয়ে—তিনহাজার বছর পরের বৈশাখ-অপরাহ্ণেরউপর।

তখন কি কেউ ভাববে তিন হাজার বৎসর পূর্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়োহাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলে উঠত ?এই মেঘান্ধকারআকাশের বিদ্যুৎচমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজেসোঁদা সোঁদা গন্ধটা কি আশা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দূর দেশের, দূরের উত্তাল মহাসমুদ্রের, ঘটনাবহুল অস্থির জীবন-যাত্রারকি ছায়া-ছবি তার শৈশবমনে ফুটিয়ে তুলত ?

কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বেরএক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রাভেঙে পাপিয়ার যে মন-মাতানো ডাক—গ্রাম্যনদীটির ধারেশ্যাম তৃণদলের উপর বসে বসে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ-কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীরসঙ্গে সে উপভোগ করেছিল ?কোথায় লেখা থাকবেবর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দকাহিনী ?

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এইকালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনবে, কোন্ পথে তারাআসবে ?

এই সন্ধ্যায় বসে গভীরভাবে একথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরের মধ্যে ডুবে গেলাম ! মেঘভরা নির্জন সন্ধ্যা—বিদ্যুৎচমক—ঝড়ের শব্দ—হঠাৎ এই জলের গন্ধেএক অপূর্ব বার্তার আনন্দে মন শিউরে উঠলো !

এই ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবহমান জীবনেরউৎসব, নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা ও অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা...আর যা আছে, তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই—কোনো ভাষার ব্যাকরণে তার প্রতিশব্দ গড়তেপারেনি। 'অনন্ত' 'শাশ্বত', 'নিত্য', 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলিএকঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না। বোঝানোযায় না প্রকৃত রূপ—যে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধমিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎচমকে, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্যে মনে আসে—অনন্তের সেবেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানেপৌঁছায়। নক্ষত্রলোকে যদি কোনো দুঃসাহসিক মানুষ যেতেচায়, তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দিষ্ট করলে তাকে চলবেনা।তাকে জোগাড় করতে হবে আলোকের রথ—একমাত্রআলোকের গতি তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখানেপৌঁছাতে হলে। এমন একটা জিনিস আছে, যা মনোজগতেআলোক রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিসটা Logic-সঙ্গত। শান্ত, সুষ্ঠু, ক্রমবদ্ধ, হুঁশিয়ার চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌঁছাতে তুমি লীলাসম্বরণকরে ফেলবে, তবুও হয়তো পৌঁছাতে পারবে না।

সে জিনিসটা কি তা বোঝানো মুশকিল, শুধু অনুভবকরে আস্বাদ করবার জিনিস সেটা। Bergson তাকেই Intuition বলেছেন বোধ হয়—আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাওতেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মেরমতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তারসম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত-জীবন—পৃথিবীরএই মৃত্যু স্পষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তাতোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার—আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই—যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বানিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। তাঁরাতা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা—শুধুএই অনন্ত অধিকারের বার্তা মানুষের প্রাণে পৌঁছিয়েদেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে—আত্মারখাদ্য কজন যোগায় ?

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষ মনে যখন বরণ করে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছেপবিত্র হবে।

কালবৈশাখী শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মতো এইঅনন্ত অধিকারের বার্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতাদগ্ধ মনেঅমৃতের বর্ষণ করুক। দূর অজানা স্বপ্নজগতের কোণ থেকেবয়ে আসুক।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব সম্পদ। একে অবহেলা নাকরে দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে এক অজানাদেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছিঅনেকদূরের আমার গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকেহাসিমুখে ছেলে-মেয়েরা মেলা থেকে ফিরে যাচ্ছে—কারুরহাতে বাঁশের বাঁশি, কারুর হাতে মাটির রংকরা ছোবা, মাটির পালকি।

একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল নতিডাঙ্গারমাঠের পথ বেয়ে ঘেঁটু ও নোনাবনের ধার দিয়ে ছাতিমবনের ছায়ায় ছায়ায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটেযাচ্ছে—পার হয়ে ওপারের চাষা-গাঁয়ে যাবে। পঁচিশ বৎসরআগে যারা ছোট ছিল, এই রকম মেলা দেখে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে তেলেভাজা জিলিপি খেতে খেতে ফিরেগিয়েছিল—তারা এখন মানুষ হয়ে অনেক দিন কর্মক্ষেত্রেপ্রবেশ করেছে, কেউ কেউ মারা গিয়েছে, কারুর জীবনব্যর্থতায় দীনতায় ভরে গিয়ে বেঁচে থেকেও নেই—আজকার এই নিষ্পাপ, অবোধ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভালো লাগে। দিদি দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ-চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়িফিরছে—

—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি দেখরে,—ও অপু। পঁচিশ বৎসর-এর পার থেকে ডাক আসে।

॥ ১লা বৈশাখ ১৩৩৫ সাল॥

আজকার দিনটি সত্যই মনে করে রাখবার মতো—সেইসকালে আটটার সময় ঘোড়া করে বার হওয়া গেল। কমলাকুণ্ডুগ্রামের বাড়িবাড়ি রুগী দেখে বেড়ালাম। কৈসুরমেয়ে, বেহারীদের বাড়ি—বেলা প্রায় বারোটার সময় ফিরেএসে গণপৎদের গাঁয়ে গেলাম। সেখানে যাবার সময় বস্তির এদিকে কাশের মাঠটা থেকে পাহাড় বেশ দেখাচ্ছিল।ভাবলাম সব লোকে আমাদের গাঁয়ে নীলপুজোর দিন দুপুরেকাদামাটি দেখতে গিয়েছে—ছড়ানো ধানগুলো এখনোকাদার ওপরে, ভালো করে গাছ বার হয়নি। ঝাঁ ঝাঁ করছেদুপুর—গণপৎদের বাড়ি গিয়ে ওদের বাড়ির মধ্যে সব ঘুরেঘুরে দেখা গেল—তারপর দই-এর শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এপারে যুগল শিশি হাতে করে ঔষধ নিতে এল—সব কাজ মিটিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে দিয়াড়া কাছারিতে। সেখানে তরমুজের শরবৎ ও লুচি ইত্যাদি ললিতবাবু খাওয়ালেন—কিছুতেইছাড়লেন না। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকেবেরুলাম—পথে ললিতবাবুর সঙ্গে Einstein সম্বন্ধেকথাবার্তা হল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—আমরা গেলামকমলাকুণ্ডু, সেই বস্তিটার কাছে তিন সীমানার মীমাংসাকরতে। সেখানে হরিবাবুর তহশিলদারও এল। সেখানথেকে বার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম—বেলা পড়েগেল—পাহাড়টার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম—গাছটায়দু'একদিন হল চড়কের কাঁটা ভাঙা হয়েছে। আজ যদি হঠাৎ যাই তবে সে সব দেখে মনে হবে আবার ছোট হয়েবনগাঁয়েই পড়ি। ক্রমে বেশ রৌদ্র গড়িয়ে বিকেল হয়েগেল। নাড়া বইহারের দিকে সূর্যটা লাল হয়ে ডুবে যেতে লাগলো। ঘোড়াটা কি চমৎকার ছোটে ! কি আরাম ! মুক্তমাঠের মধ্যে হাওয়ায় ওরকম ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি আনন্দের ! পথে গণপৎ ঝা ও সহদেব ভকতের সঙ্গে দেখা। ইসমাইলপুর জঙ্গলে একজন কে আগুন দিয়েছে—নামবললে হংসরাজ—আসরফি আমিন জমি মেপে দিয়েছেবললে। দিয়াড়ায় যব গম সব কাটা হয়ে গিয়েছে—তারপরএসে সেই যে জায়গাটা আমি রোজ ঘোড়া নিয়ে পাহাড়দেখি, সেখানে এলাম। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েরইলাম—বড় ভালো লাগল—মুক্ত উদার মাঠ, হু হু নির্মলহাওয়া—দূরবিসর্পিত দিক্‌চক্রবাল—জঙ্গলের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। তার পাশ দিয়ে এসে লোধাইটোলার ওই পথটা দিয়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো ! ফিরে এসে স্নান করলাম। দিনটা ভালো লাগল—এগার ঘণ্টা ঘোড়ার ওপর কেটেছে আজ।এত ক্লান্ত কোনো দিন হইনি।

॥১৬ই এপ্রিল ১৯২৮॥

আজ বৈকালের দিকে ছোট ঘোড়াটা করে ললিতবাবুর দিয়াড়া কাছারি গেলাম। বেশ লাগল—বাইরে টেবিল পেতেললিতবাবু ও মোহিনীবাবু বসে, হু হু করে পুবে হাওয়া আসছে। সারাদিন গরমের পরে বেশ লাগল। টেলিস্কোপে নক্ষত্রটা দেখে নিলাম। Orion Nebula-টাও দেখলাম।তারা Observation-এর জন্যে টেলিস্কোপটা খাটিয়ে রেখেদিয়েছেন। এখন মনে পড়লো ছেলেবেলায় কলকাতাথাকতে দেখেছিলাম, চিৎপুর রেলের ধারে একটা লোক এইরকম টেলিস্কোপ নিয়ে মাপ করছেন—বাবা বললেন, দুরবীন। না জানি সে লোকটা এখন বেঁচে আছে কি-না। তারপর গল্পগুজব করবার পর রাত্রি সাড়ে ন'টার সময়সেখান থেকে বেরুলাম। লোধাইটোলা পর্যন্ত একজনআলো দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। ভগনি ভগৎ খাতির করেসুপারি ও সিগারেট দিলে। তারপরই অন্ধকার—পথ দেখা যায় না—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ—নক্ষত্রেরআলোয় একটু একটু পথ দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া বেশ ছুটল।এক জায়গায়—এমন romantic লাগছিল—বালা মণ্ডলেরটোলার ওদিকের ঘেরা ক্ষেত থেকে একটা বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলে গেল। বামা বৈরিজের বাসাটা ছাড়িয়েমাঠের মধ্যে পড়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো—একেবারে জঙ্গল—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ। কাছারিতে এসেদেখলাম ললিতবাবু Traverse টেবিলের জন্য Draft-টাপাঠিয়ে দিয়েছে। মানী ভাগলপুর থেকে এসেছে। টেবিলেরওপর গ্লাসের জলে তিনটে বড় ম্যাগনোলিয়া সাজানো।

॥ ১৭ই এপ্রিল ১৯২৮ ॥

বৈকালের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে গেলাম। এক দৌড়ে এতটা পথ কোনো ঘোড়াকে আমি যেতে দেখিনি।লোধাইটোলার ওপারের মাঠে অনেক খেড়ির গাছ গতবৎসরের বীজ থেকে বেরিয়েছে। সেখানে ঘোড়াকে ছেড়েদিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াটা নাকের সামনেরবাতাসে ক্রমে ক্রমে মিশে যাচ্ছে দেখতে দেখতে ধীর, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে লোধাইটোলার খামার দিয়ে নিয়েএলাম। আজ খুব হাওয়াটা।

॥১৮ই এপ্রিল ১৯২৮॥

আজও খেড়িক্ষেত দিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দাঁড়ালাম।পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে—আসরফিকে কাল বড়রেগে গিয়ে চাবুক নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে আমাকেক্ষেত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

আজকাল এই অপরাহ্নগুলো যে কী সুন্দর লাগে !প্রতিদিন লেখার কাজ সেরে এই পাহাড়ের এপারেলোধাইটোলায় খেড়িক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াই।আজ অপূর্ব ভাব মনে এল। সেই বোর্ডিং থেকে গ্রীষ্মেরছুটিতে এসে সোঁদালি ফুলভরা ঝোপের তলা দিয়ে সকালবেলা মাঠে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওধারের মাঠটা—স্নিগ্ধ নদীজলের গন্ধ—উমা পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজোকরত—সেই গ্রামের হাওয়ায় মাঠের রূপে, নদীর জলেরস্নিগ্ধতায়, ফুলে ফলে আত্মা গড়ে উঠেছিল—কি অপূর্বআনন্দই এরা জীবনে এনে দিয়েছিল একদিন ! আজও সেসব আছে কিন্তু তাদের যেন ছেড়ে দিয়েছে, আর তারাআমার নয়। শৈশবের সে গ্রাম এখন আমার কাছ থেকেবহুদূর চলে গিয়েছে—সে সব পুরোনো পাখির ডাক, ফুলফলের সুগন্ধ, স্নেহময় মুখের হাসি স্বপ্ন হয়ে দূরেঅতীতে মিশিয়ে গিয়েছে। দশ বৎসর আগে এমন দিনেসকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেনে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছেশেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসেকচিপাতা ওঠা বসন্তের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনাহয়েছিলাম। সেই প্রথম বৃষ্টির সোঁদা সোঁদা ভিজা মাটির গন্ধ—তারও আগে সেই P.C.Roy-এর ওখানে নেমন্তন্ন, বৃন্দাবন চাকর—দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়েশুয়ে জীবনের প্রথম-যাত্রা—বড় মধুর স্বপ্নমাখা সেদিনগুলো—

আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবেঅপরের কাছে তার মাধুর্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবুভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন ভুলে না যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময় কারো কোনোদিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখে ওইসবদিনগুলো এক গ্রাম্য বালককে যে সুখ একদিন দিয়েছিল, দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।

সন্ধ্যা হয়েছে। বনঝাউগাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম। বনঝাউ গাছের মাথায় চতুর্থীর চাঁদউঠেছে। অল্প অল্প মেটে জ্যোৎস্না এখনো ফোটেনি—নির্জনকাশজঙ্গল—বনঝাউ গাছ—মাথার ওপরে চাঁদ—দ্রুতগামীঘোড়া—বেশ লাগে।

॥ ২৪শে এপ্রিল, ১৯২৮।।

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যেযে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপউপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী)'বিচিত্রা'তে পাঠিয়েদিয়েছি।

ঘোড়া করে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে গেলাম। খুববন—খুব বন—এত বনের পথ আমার জানা ছিল না। সেইবনঝাউয়ের বনের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না যখন উঠেছে, তখন সোঁদা সোঁদা গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে এলাম। সুন্দর—অপূর্ব জ্যোৎস্নায় মনেভাবছিলাম ভরতদের ঘরে বসত যে বালকটি, কঞ্চি নিয়ে খেলা করত সে—এসব Egotism ছেড়ে এলাম। তবুও এইঘোড়া চড়ে জ্যোৎস্না ওঠা জঙ্গলের মৃদু সুঘ্রাণ উপভোগকরতে করতে ওই কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে।

॥২৬শে এপ্রিল ১৯২৮।।

পরিশিষ্ট সাহিত্যের কথা

সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্ররূপ এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়েএখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক প্রায় সম্ভবইনয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিকআর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে।সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণবৃহৎআনন্দলোকের আবাহন, যার জন্য প্রতি শক্তিশালীকবিমানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনেরঅনির্দেশ্য ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'রআবহাওয়ায় যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপেসম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তার লেখারমাল-মশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করেচলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছেতাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্যে দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনিসকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালোবাসারআলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎএবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়।আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যাবেন। চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতমহৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে

অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথাবলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠবাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানেএকান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনেরদিক দিয়ে তার পক্ষে চরম একাকিত্ব একটি প্রকাণ্ডসত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও।'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে, তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্ম-কোলাহলের ঠিকমাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপেরসামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য। ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড়রেশময় একটি 'লিরিক', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে,—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার ?উত্তর হচ্ছে, দরকার,—অত্যন্ত বেশি দরকার আরো এইজন্যে যে, এইসব প্রশ্নএখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্‌ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু-পাশের এই দুই রকম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যেভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলাজানালা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবনঅহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনেরএই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তেআপনাকে বড় করে যায়। দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতারসহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্তত খণ্ড-কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে।প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষেরমধ্যেই কম বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকিস্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্তত কোনোকোনো ক্ষণের জন্যেওআদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতিরঅনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশারমতন হয় আসক্ত—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজহচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিতজীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলীসম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদেরকল্পনা ও অনুভববৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিকপ্রধানত জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায় এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছেঅবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যেমূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,—সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবংছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সঙ্গেসমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করেচলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন তার মর্ম এই যে, আমাদের ধরণীভারি সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকুবোঝানো হল, আমাদের এই দৃষ্টিটা বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে রিয়্যালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধগতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলেনা, তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাঁক থেকে আমাদেরউদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ওশিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটিআধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এইযে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর কারণ তা হলেতখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না।আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম কোনো আদেশের উপরযদি জোর দেওয়া হয় তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুরআমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব, তাদেরও শেষ পর্যন্তউপকার কিছু হবে না। রসসাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমনসুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিকদিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণেপারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও

অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয়রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তখন অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্নপাঠকের মনে—প্রধানত 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদেরসবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয়কোনো সত্যিকারের কথাসাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদেরচিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকারকরেন। কেউ বাঁচেনি, বড় বড় নামওয়ালা কথাসাহিত্যিকতলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগেরপ্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করেনা। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন পণ্ডিত, দু'একজনবৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডনকুইকজোট কে পড়ে ?চসার, দান্তে, মিল্টন এঁদের কথা বাদদিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদের পাতা ওল্টায় না—সকলে তো কাব্যপ্রিয় না—কিন্তু অত বড় যে নামজাদাঔপন্যাসিক বালজাক তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোক শখ করে পড়ে ?স্কট, হেনরি জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে নাউঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে; অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়েযায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গাল-ভরাকথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স রচনা করে তারপ্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটিসকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতেশিকড় চালিয়ে যা রস সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষমূক নরনারীর আশাআকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা যাতে বাণী খুঁজেপেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীরমতো জীবনের রসে বঞ্চিত, হয়তো সংসারবিবাগী, ঊর্ধ্ববাহু মৌনী, যোগীর মতো সাধারণ সাংসারিক জীবনেরবাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবেতা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে রস হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ওজীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ নেওয়ার ভারনিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষেরসঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হবে, যেবাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবলমানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ারবলেছেন, মানুষে যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, সবইসাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে, শোভনতারখাতিরে তিনি যদি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণথেকে যাবে।

'এমা বোভারি'র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে !

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই ?জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মতো করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্যনয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃততাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাইবহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তাপরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনেপতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলেরউপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনেরস্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দুই একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগান্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকেঅনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্যকোনো সমস্যাদি সম্বন্ধে

মতবাদই হোক, সব কিছুরই প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতর থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যইথাকে, কোনো প্রচার বিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফলেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাতনষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতেগিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনেরাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মতো এক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবৃদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ওঅশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরেরপৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতেপারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানসচেতনায় পাই।এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তাহয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলওনয়। সংকীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতিপ্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণবুদ্ধিআমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিলবলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকেপেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ কী জীবনে কী সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবৃদ্ধি যুক্ত নাহলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিতনীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্তথেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্টপরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তরব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিচ মানুষের জীবনও এতবিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতাপদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সেযেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এই-ই নয়। তা ছাড়াবৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ জীবন-সমাজের মূল সত্তার সঙ্গেজড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতেপারি !

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মতোপরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যেকথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের দেশে কি আছে মশাই যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই "থোড় বড়ি খাড়া, খাড়াবড়ি থোড়"—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখাযায়—এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশেরসাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময়জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজ্‌নে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবনঅখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাইবলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

আমার লেখা

আমি কেমন করে লেখক হলাম, এ আমার জীবনের, আমারনিজের কাছেই, একটা অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য হয়তো একথাঠিক, নিজের জীবনের অতি তুচ্ছতম অভিজ্ঞতাও নিজেরকাছে অতি অপূর্ব ! তা যদি না হত, তবে জগতে লেখকজাতটারই সৃষ্টি হত না।নিজের অভিজ্ঞতাতে এরা মুগ্ধ হয়েযায়—আকাশ প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কত কল্পলোকরচনা করছে যুগে যুগে—তার তলে কত শত শতাব্দী ধরে মানুষ নানা তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের দিন কাটিয়ে চলেছে; মানুষের জন্ম-মৃত্যু, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বিষাদ, ঋতুর পরিবর্তন, বনপুষ্পের আবির্ভাব ও তিরোভাব—কতছোট বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে—কে এসব দেখে, এসব দেখে মুগ্ধ হয় ?

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের চোখে কল্পনা সবসময়েই মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে। অতি সাধারণপাখির অতি সাধারণ সুরও তাদের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে, অস্তদিগন্তের রক্তমেঘস্তূপ স্বপ্ন জাগায়, আবারহয়তো তারা অতি দুঃখে ভেঙে পড়ে। এরাই হয় লেখক, কবি, সাহিত্যিক। এরা জীবনের সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক।এক যুগের দুঃখবেদনা আশা-আনন্দ অন্য যুগে পৌঁছে দিয়েযায়।

আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতা তাই চিরদিনই আমার কাছে অভিনব, অমূল্য, দুর্লভ হয়ে রইল। যে ঘটনা আমারজীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে বাঁক ফিরিয়েদিয়েছে —আমার জীবনে তার মূল্য অনেকখানি।

১৯২২ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নিয়েডায়মন্ডহারবার লাইনে একটা পল্লীগ্রামের হাইস্কুলেমাস্টারির চাকুরি নিয়ে গেলুম আষাঢ় মাসে।

বর্ষাকাল, নতুন জায়গায় গিয়েছি। অপরিচিতের মহল নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। বৈঠকখানা ঘরেরসামনে ছোট একটু ঢাকা বারান্দাতে একলা বসে সামনেসদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি ষোলসতেরো বছর বয়সের ছেলেকে একখানা বই হাতে যেতে দেখে তাকে ডাকলাম কাছে। আমার উদ্দেশ্য, তার হাতে কিবই দেখব এবং যদি সম্ভব হয় পড়বার জন্যে চেয়ে নেবএকদিনের জন্যে।

বইখানা দেখেছিলাম, একখানা উপন্যাস। তার কাছেচাইতে সে বললে, এ লাইব্রেরির বই, আজ ফেরত দেওয়ারদিন। আপনাকে তো দিতে পারছি নে, তবে লাইব্রেরি থেকেবই বদলে এনে দেব এখন।

—লাইব্রেরি আছে এখানে ?

—বেশ ভালো লাইব্রেরি, অনেক বই। দু আনা চাঁদা।

—আচ্ছা চাঁদা দেব, আমায় বই এনে দিয়ো।

ছোকরা চলে গেল এবং ফেরবার পথে আমাকে একখানাবই দিয়েও গেল। আমি তাঁকে বললাম—তোমার নামটি কিহে ?

সে বললে—আমার নাম পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এগ্রামে আমাকে সবাই বালক-কবি বলে জানে।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—বালক-কবি বলে কেন ?কবিতা-টবিতা লেখো নাকি ?

ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে বললে—লিখি বই কি। নালিখলে কি আমাকে বালক-কবি নাম দিয়েচে?আচ্ছা কাল এনে দেখাব আপনাকে।

পরদিন সে সকাল বেলাতেই এসে হাজির হল। সঙ্গেএকখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা গোছের। আমাকেদেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এই কাগজখানা আমাদের গাঁথেকে বেরোয়। এর নাম 'বিশ্ব'। এই দেখুন প্রথমেই 'মানুষ' বলে কবিতাটি আমার। এই আমার নাম ছাপার অক্ষরেলেখা আছে কবিতার ওপরে—বলেই ছোকরা সগর্বে কাগজখানা আমার নাকের কাছে ধরে নিজের নামটি আঙুলদিয়ে দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ সত্যিই—লেখা আছে বটে, কবিপাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাহলে তো নিতান্ত মিথ্যে বলেনিদেখছি।

কবিতাটি সেই আমায় পড়ে শোনালে। বিশ্বের মধ্যে মানুষের স্থান খুব বড়—ইত্যাদি কথা নানা ছাঁদে তার মধ্যেবলা হয়েছে।

অবশ্য কাগজখানা দেখে আমার খুব ভক্তি হল না।স্টেশনের কাছে একটা ছোট প্রেস আছে এখানে, সেইপ্রেসেই ছাপানো—অতি পাতলা জিল-জিলে কাগজ। পত্রিকাখানিকে 'মাসিক', 'পাক্ষিক' ইত্যাদি না বলে 'ঐকিক' বললেই এর স্বরূপ ঠিক বোঝানো হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীরপত্রিকা গ্রামের উৎসাহী লেখা-বাতিকগ্রস্ত ছেলে-ছোকরারদল চাঁদা তুলে একটিবার মাত্র বার করে, কিন্তু পরের বারেউৎসাহ মন্দীভূত হওয়ার দরুন আশানুরূপ চাঁদা না ওঠাতেবন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—এ সেই শ্রেণীর পত্রিকা।

তবু আমার ঈর্ষা না হয়ে পারল না। আমি লিখি না, বালেখার কথা কখনো চিন্তাও করি না। অথচ এতটুকুছেলে এর নাম দিব্যি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেল। এর ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল, মনে ভাবলাম, বেশ ছোকরা তো। অক্ষর মিলিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে ! সাহিত্যেরসমঝদারিত্ব তার মধ্যে ছিল তা আমি জানি। তখনকারআমলের একজন বিশেষ লেখকের বই না থাকলে পল্লীগ্রামের কোনো লাইব্রেরি চলত না। সেই লেখকেরএকখানা বই-এর তিন-চারকপি পর্যন্ত রাখতে হতকোনো-কোনো বড় লাইব্রেরিতে।

ছেলেটি বলত—ওসব ট্র্যাশ-ট্র্যাশ! দেখবেন ওসবটিকবে না।

এক এক দিন পাঁচুগোপাল আমাকে নিয়ে গ্রামের বাইরেমাঠে বেড়াতে যেত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চোখও তার বেশ ছিল—মাঝে মাঝে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে আমাকেশোনাত। অনেকগুলো কবিতা হলে পর একটা কবিতার বইছাপাবে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করত। সেই সময় কলকাতার কোনো 'পাবলিশিং হাউস' ছয়-আনা গ্রন্থাবলী প্রকাশ

শুরুকরে দিল—তার প্রথম বই লিখলেন রবীন্দ্রনাথ।রবীন্দ্রনাথের বইখানি স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে পাঁচুগোপাল আমায় এনে দিয়ে বললে—"এ বই নিতে ভিড় নেই। নতুনএসেছে, এক আধ জন নিয়েছিল, কালই ফেরত দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখুনগে যান অমুকের বই-এর জন্যে কি যেমারামারি। ডিটেকটিভ উপন্যাস না রাখলে লাইব্রেরি উঠে যাবে। কেউ চাঁদা দেবে না।" পরের মাসে আর একখানা বইবেরুল। সেখানা আমার কাছে নিয়ে এসে সেবললে—"আমি একটা কথা ভাবছি, আসুন আপনাতে আমাতে এইরকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুববিক্রি হবে, আর একটা নামও থেকে যাবে। আপনি যদিভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।" আমি বিস্ময়ের সুরেবললাম—"তুমি আর আমি দুজনে মিলে বই-এর কারবারকরব, এ কখনো সম্ভব ?এ ব্যবসার আমরা কিই বা জানি ?তা ছাড়া বই লিখবেই বা কে ?এতে লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে হবে, সে পয়সাই বা দেবে কে ?"

সে হেসে বললে—"বাঃ তা কেন, বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন।"

বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসতাম বটে, কিন্তু নিজে কলমধরে বই লিখব এ ছিল সম্পূর্ণ দুরাশা আমার কাছে। অবিশ্যিপাঠ্যাবস্থায় অন্য অনেক ছাত্রের মতো কলেজ ম্যাগাজিনেদু-একটা প্রবন্ধ, এক-আধটা কবিতা যে না লিখেছি তা নয়, বা প্রতিবেশীর অনুরোধে বিবাহের প্রীতি-উপহারে কবিতাযে দু-পাঁচটা না লিখেছিলাম তাও নয়—সে কে না লিখে থাকে ?

সুতরাং আমি তাঁকে বললাম—"লেখা কি ছেলেখেলাহে যে কলম নিয়ে বসলেই হল ?ওসব খামখেয়ালি ছাড়।আমি কখনো লিখিনি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়তো পারবে—আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

সে বললে—"খুব হবে। আপনি যখন বি.এ. পাস, তখনআপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না। একটু চেষ্টা করুন, তাহলেই হয়ে যাবে।"

তখন বয়েস অল্প, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি, তবুও আমার মনেহল, বি.এ. পাস তো অনেকেই করে, তাদের মধ্যে সকলেইলেখক হয় না কেন ?অথচ বি.এ. পাস করা লোকেদের ওপর পাঁচুগোপালের এই অহেতুক শ্রদ্ধা ভেঙে দিতেও মনচাইল না। এ নিয়ে কোনো তর্ক আমি আর তাঁর সঙ্গেকরিনি।

কিন্তু করলেই ভালো হত, কারণ এর ফল হয়ে দাঁড়ালবিপরীত। দিন দশেক পরে একদিন স্কুলে গিয়ে দেখিসেখানে নোটিশ-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে সর্বত্র ছাপানো কাগজ টাঙানো—তাতেলেখা আছে, বাহির হইল ! বাহির হইল ! ! বাহির হইল ! ! ! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস।

লেখকের নামের স্থানে আমার নাম দেখলাম।

আমার তো চক্ষুস্থির। এ নিশ্চয় সেই পাঁচুগোপালেরকীর্তি। এমন ছেলেমানুষি সে করে বসবে জানলে কি তারসঙ্গে মিশি ! বিপদের ওপর বিপদ, স্কুলে ঢুকতেই শিক্ষকছাত্রবৃন্দ সবাই জিজ্ঞেস করে,—"আপনি লেখক তা তোএতদিন জানতাম না মশাই ?বেশ ! তা বইখানা কিবেরিয়েছে নাকি ?আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।" হেডমাস্টার ডেকে বললেন, তাঁর স্কুলের লাইব্রেরিতেএকখানা বই দিতে হবে। সকলের নানারূপ সকৌতূহল প্রশ্নএড়িয়ে চলি সারাদিন—কবে থেকে আমি লিখছি, আর আর কি বই আছে, ইত্যাদি। স্কুলের ছুটির পরে বাইরে এসেস্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে !

তাকে খুঁজে বার করলাম বাসায় এসে। দস্তুরমতোতিরস্কার করলাম তাকে, এ তার কি কাণ্ড ! কথার কথা একবার একটা হয়েছিল বলে একেবারে নাম ছাপিয়েএরকমভাবে বার করে, লোকে কি ভাবে !

সে নির্বাক হয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতেবললে—"তাতে কি হয়েছে ?আপনি তো একরকম রাজিইহয়েছেন লিখতে। লিখুন না কেন !"

আমি বললাম—"বেশ ছেলে বটে তুমি ! কোথায় কিতার ঠিক নেই, তুমি নাম ছাপিয়ে দিলে কি বলে, আর দিলে দিলে একেবারে স্কুলের দেওয়ালে, নোটিশ বোর্ডে সর্বত্রছড়িয়ে দিয়েছ, এ কেমন কাণ্ড ?নামই বা পেলে কোথায় ?কে তোমাকে বলেছিল ও নামে আমি কিছু লিখেছি বালিখব ?"

যাক—পাঁচুগোপাল তো চলে গেল হাসতে হাসতে। এদিকে প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়েউঠতে হল—বই বেরুচ্চে কবে ?কত দেরি আছে আর বই বেরুবার ?—মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সে যা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে তার আর চারা নেই। আমিএখন নিজের মান বজায় রাখি কেমন করে ?লোকেরঅত্যাচারের চোটে তো অস্থির হয়ে পড়তে হয়েচে।

সাতপাঁচ ভেবে একদিন স্থির করলাম—এক কাজ করাযাক। সে এক টাকা সিরিজের বই কোনোদিনই বের করতেপারবে না। ওর টাকা কোথায় যে বই ছাপাবে ?বরং আমিএকখানা খাতায় যা হয় একটা কিছু লিখে রাখি—লোকেযদি দেখতে চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে, আমারতো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব। কিন্তুলিখি কি ?জীবনে কখনো গল্প লিখিনি, কি করে লিখতে হয়তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট জোগাড় করে, কি কৌশলেতা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে ?প্লটই বা পাইকোথায় ?আকাশ-পাতাল ভাবি প্রতিদিন, কিছুই ঠিক করেউঠতে পারি নে। গল্প লেখার চেষ্টা কোনোদিন করিনি।পাঠ্যাবস্থায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেসাধ হত, লেখক হতে পারি আর না পারি, একজন বড় বক্তা হতে হবেই।

কিন্তু লেখক হবার কোনো আগ্রহই কোনোদিন ছিল না, সে চেষ্টাও করিনি। কাজেই প্রথমে মুশকিলে পড়ে গেলাম।সাত-পাঁচ ভেবে প্লট সংগ্রহ করতে পারি না কিছুতেই। মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায়নি। সবকিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়।

অবশেষে একদিন একটা ঘটনা থেকে মনে একটা ছোটগল্পের উপাদান দানা বাঁধল। সেই পল্লীগ্রামে একটি ছায়াবহুলনিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্রবিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্যবধূকে দেখি পথপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসি কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তার সঙ্গেআমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয়আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটিরহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্রকরে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি ! গল্পশেষ করে সেই গ্রামের দু-একজনকে পড়ে শোনালাম—পাঁচুকেও।কেউ বলে ভালোহয়েচে, কেউ বলে মন্দ হয়নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়েদিলাম। সে-ও বললে ভালোহয়েচে। আমি তখন একেবারেকাঁচা লেখক; নিজের ক্ষমতার ওপর কোনো বিশ্বাস আদৌজন্মায়নি। যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমিতখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপরনির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটিরসমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল—তার মত শুনে খুশিহলাম।

পাড়াগাঁয়ে স্কুলমাস্টারি করি। কলকাতার কোনো সাহিত্যিক বা পত্রিকা-সম্পাদককেই চিনি না—সুতরাং লেখাছাপানো সম্বন্ধে আমায় একপ্রকার হতাশ হতে হল।এইভাবে পূজার অবকাশ এসে গেল, ছুটিতে দেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম। পুনরায় ফিরে এসে কাগজপত্রেরমধ্যে থেকে আমার সেই লেখাটি একদিন বার করেভাবলাম, আজ এটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টাকরে দেখা যাক।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পত্রিকা আপিসের সামনে এসে পড়াগেল। আমার মতো অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন লেখকের রচনাতারা ছাপবে এ দুরাশা আমার ছিল না, তবু সাহস করেগিয়ে ঢুকে পড়লাম। দেখা যাক না কি হয়, কেউ খেয়ে তো ফেলবে না, না হয় লেখা না-ই ছাপবে। ঘরে ঢুকেই একটিছোট টেবিলের সামনে যাঁকে কর্মরত দেখলাম, তাঁকেনমস্কার করে ভয়ে ভয়ে বলি—"একটা লেখাএনেছিলাম—"; ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আরকোথাও আপনার লেখা কি বেরিয়েছিল ?আচ্ছা রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে। ঠিকানাটা রেখে যাবেন।"

লেখা দিয়ে এসে স্কুলের সহকর্মী ও গ্রামের আলাপী বন্ধুদের বলি—"লেখাটা নিয়ে বলেছে শিগগির ছাপবে।" চুপি চুপি ডাকঘরে গিয়ে বলে এলাম, আমার নামে যদি বুকপোস্ট গোছের কিছু আসে, তবে আমাকে স্কুলে বিলিয়েন না করা হয়। কারণ লেখা ফেরত এসেছে এটা তাহলেজানাজানি হয়ে যাবে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। দিন গুনি,একদিন সত্যিই ডাকপিয়ন স্কুলে আমায় বললে—আপনারনামে একটা বুকপোস্ট এসেচে, কিন্তু গিয়ে নিয়ে আসবেন।আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নবজাত রচনার প্রতিঅপরিসীম দরদ যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরা বুঝবেন আমারদুঃখ। এতদিনের আকাশকুসুম চয়ন তবে ব্যর্থ হল, লেখাফেরত দিয়েচে।

কিন্তু পরদিন ডাকঘর থেকে বুকপোস্ট নিয়ে খুলে দেখি যে, আমার রচনাই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারীসম্পাদকের চিঠি। তাতে লেখা আছে, রচনাটি তাঁরামনোনীত করেচেন, তবে সামান্য একটু-আধটু অদল-বদলের জন্যে ফেরত পাঠানো হল, সেটুকুকরে আমি যেন লেখাটি তাঁদের ফেরত পাঠাই, সামনের মাসেই ওটা ছাপা হবে।

অপূর্ব আনন্দ আর দিগ্বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ডাকঘর থেকে ফিরি। সগর্বে নিয়ে গিয়ে চিঠিখানা দেখাতেই সবাইবললেন—"কারুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝিওখানে ?আজকাল আলাপ না থাকলে কিছু হবার জো-টি নেই। সব খোশামোদ, জানেনই তো।" তাঁদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, যাঁর হাতে লেখা দিয়েএসেছিলাম, তাঁর নাম পর্যন্ত আমার জানা নেই ! তারপরসে গ্রামের এমন কোনো লোক রইল না যে আমারচিঠিখানা না একবার দেখলে। কারো সঙ্গে দেখা হলে পথেতাকে আটকাই এবং সম্পূর্ণ অকারণে চিঠিখানা আমারপকেট থেকে বেরিয়ে আসে, এবং বিপন্ন মুখে তাকেবলি—তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েচে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই। হায়, সে সবলেখকজীবনের প্রথম দিনগুলি ! সে আনন্দ, সে উৎসাহ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার বিস্ময় আজও স্মরণে আছে, ভুলিনি। নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ নিহিত, লেখকজীবনের বড় পুরস্কার সবচেয়ে তাই-ই। স্বচ্ছ সরল ভাবানুভূতির যে বাণীরূপ কবি ও কথাশিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে যান—তা সার্থক হয়তখনই, যখন পাঠক সেই ভাব নিজের মধ্যে অনুভব করেন।এইজন্য লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি ভিন্ন কখনই কোনোরচনাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

বালক-কবির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সে-ই একরকম জোরকরে আমাকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

পাঁচুগোপালের সঙ্গে মাঝে দেখা হয়েছিল। সে তখনচব্বিশ পরগণার কাছে কি একটা গ্রামের উচ্চ প্রাথমিকপাঠশালার হেডমাস্টার। এখনো সে কবিতা লেখে।